ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

চতুর্থ তদন্ত

galporchhabi.blogspot.in

চতুর্থ তদন্ত

galporchhabi.blogspot.in

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

১

আমার বন্ধু ওমপ্রকাশ মাকিন জাতিতে পাঞ্জাবী হলেও আমরা দুজনে একই স্কুলে পড়েছি। একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি, সিনেমা দেখেছি, বড় হয়েছি। কিন্তু কেন কে জানে আজ এতদিনেও ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের চিড় খায়নি। আসলে ওমপ্রকাশ খুব ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছেলে। বেশ হাসিখুশি এবং প্রাণোচ্ছল। স্কুলের ছেলেরা ওকে পেঁইয়া বলে রাগালে ও রাগত না। ওর ভাষার বিকৃত অনুকরণ করে কেউ ওকে ভ্যাংচালে ও কিছু মনে করত না। কিন্তু ওর পাগড়িতে ঠাট্টার ছলেও কেউ সামান্য একটু হাত দিলে ওর চোখ দুটো অসম্ভব রকমের লাল হয়ে উঠত। আমি বুঝতে পারতাম ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটবে এবার। তাই সে সময় আমিই ওকে সামলাতাম। ওকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে শান্ত করে অন্যদের ভর্ৎসনা করতাম এবং বাধা দিতাম। ওমপ্রকাশ বুঝত। শান্ত হোত। একটি ভালো জাতের হিংস্র কুকুর যেমন তার মনিবের কথা শুনে বিরক্তিকর দেশী কুত্তাগুলোর ওপর প্রতিশোধ না নিয়েই ফিরে আসে ঠিক সেই ভাবেই চলে আসত ও আমার কাছে। ও জানত আমি অন্য ছেলেদের মতো নই। নম্র, ভদ্র, একটু অন্যরকম। আমি কখনো ওর সঙ্গে বন্ধুত্বের এবং ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে ওর মর্যাদায় লাগে এমন কোন রসিকতা করিনি। তাই ও আমার প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল।

ওমপ্রকাশের বাবা কুন্দনপ্রকাশ একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। অত্যন্ত রাশভারী এবং ব্যস্ত লোক। বছরের অধিকাংশ সময়ই উনি বাইরে বাইরে কাটান। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং গাম্ভীর্য এমনই যে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের তুলনা করা চলে। সামনে দাঁড়াতে ভয় হয়। কথা বলতে রোমাঞ্চ।

ওমপ্রকাশের মা নেই। তবে একটি বোন আছে। নাম নীতা। খুব ভালো বাংলা বলতে পারে। বাংলা স্কুলে লেখাপড়া করে। খুব ভালো মেয়ে। আমাকে ঠিক ওর নিজের দাদার মতোই ভালবাসে। যেমন সুন্দর চেহারা তেমনি মিষ্টি ওর ব্যবহার। প্রতি বছর ভাইফোঁটার দিন ও আমাকে আমাদের প্রথা মতো ফোঁটা দেয়। আর আমি ওকে প্রতি বছর একটি করে বাজারের সেরা ডায়েরি উপহার দিই। সেই ডায়েরিতে সুন্দর হস্তাক্ষরে ও ওর দিনলিপি লিখে রাখে। ফুট ফুটে কিশোরী মেয়েটি শিক্ষায় দীক্ষায় রূপে গুণে যেন সবার সেরা।

সেদিন দুপুরে সহকর্মিদের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছি এমন সময় অফিসারের ঘরে হঠাৎ একটি ফোন এলো। উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে 'হ্যালো' করতেই পিনপিনে কণ্ঠস্বর শোনা গেল···আমি ওমপ্রকাশ বলছি।

অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং।

অম্বর! তুই ভাই এক্ষুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলে যা। নীতা তোকে একটা জিনিস দেবে সেটা নিয়ে তুই একটুও দেরি না করে সোজা ধানবাদে চলে আসবি। এখানে গোলার মোড়ে আমার নাম করে যে লোক তোর কাছে আসবে ওটা তুই তাকে দিয়ে দিবি।

তুই কোথা থেকে ফোন করছিস ওম? হ্যাল্লো···।

আর কোন উত্তর এলো না। রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম।

মনে কেমন একটা খটকা ধরে গেল। এরকম ফোন এর আগে আর কখনো আসেনি আমার কাছে। অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এখুনি না হয় ওর বাড়িতে আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু নীতা কি দেবে আমায়? কি দিতে পারে। সেটা এমনই কি এমন মহামূল্য বস্তু যা নিয়ে এখুনি আমাকে ধানবাদে যেতে হবে? ভেবে কোন কুল পেলাম না। ধানবাদের ওপর দিয়ে এর আগে অনেকবার গেছি। তবে নামিনি

কখনো। গোলার মোড় কত দূর জানি না। নামটা যদিও শোনা তবু ব্যাপারটা খুবই রহস্যময়। আমি কিছুই বুঝতে না পেরে একটু অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম।

অফিসে আমার সঙ্গে পদস্থ অফিসার ও সহকর্মীদের কেন জানি না এক দারুণ মধুর সম্পর্ক আমার অজান্তেই গড়ে উঠেছে। ওরা আমাকে এত বেশি ভালোবেসে ফেলেছে যে আমার একটা মৌখিক আবদারের আধিপত্য বিস্তৃত হয়ে গেছে ওদের মধ্যে। তাই আসা যাওয়ার ব্যাপারে অবাধ একটা স্বাধীনতা আমি অর্জন করে ফেলেছি। যাই হোক। সহকর্মীদের বলে আমি প্রথমেই চলে এলাম মৌরিগ্রামে আমার নিজের বাসায়।

সম্প্রতি আমি নিজের জন্য একটি স্থায়ী আস্তানা তৈরী করেছি এখানে। চার কাঠা জমির চারদিকে গাছপালা লাগিয়ে মধ্যিখানে নিজের জন্য একটি মাঝারি ধরণের ঘর তৈরী করেছি। অ্যাটাচড্ বাথ। সুগৃহ। এখানে আমার ঠাণ্ডা মাথার কাজগুলো বেশ নির্বিঘ্নেই হয়। ঘরে এসে জামা কাপড় বদলে গুপ্তস্থানে রাখা অটোম্যাটিকটাও সঙ্গে নিয়ে সোজা চলে এলাম নীতাদের বাড়ি। শিবপুর বি. গার্ডেনের কাছে ওদের মার্বেল প্যালেসে।

দরজায় কলিং বেল টিপতেই নীতা এসে দরজা খুলে দিল। ওর মুখ কেমন যেন থমথমে। পূর্ণিমার চাঁদে গ্রহণ লাগলে যেমন হয় ঠিক তেমনিটি।

ওম কোথায়? আমি যেন কিছুই জানি না এমন ভাবে প্রশ্ন করলাম ওকে।

নীতা আমার সে কথায় উত্তর না দিয়ে ম্লান মুখে আমাকে একটা সোফায় বসতে বলে তাড়াতাড়ি ঘরের ভেতর থেকে একটা অ্যাটাচি বার করে আনল। তারপর সেটা আমার হাতে দিয়ে বলল—দাদার ফোন পেয়েছেন নিশ্চয়ই? না পেলে এই ভর দুপুরে অসময়ে আসতেন না।

হ্যাঁ পেয়েছি।

তাহলে এটা যাকে দেবার দিয়ে দেবেন। আর···।

আর? একি! তোর মুখ অমন ফ্যাকাসে হয়ে গেল কেন? তোর চোখে জল দেখছি, কি হল তোর?

নীতা কান্না ধরা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—পারেন তো দাদাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন।

তার মানে?

নীতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—দাদার খুব বিপদ।

বুঝেছি। তোর বাবার খবর কি?

বাবা এখনো ফেরেন নি গোয়া থেকে।

কিন্তু ব্যাপার কি নীতা? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

নীতা অপলকে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেই রকমই কান্না ধরা গলায় বলল—বেল্-চেম্বার।

নামটা শুনেই আঁৎকে উঠলাম আমি—স্ট্রেঞ্জ। কিন্তু তার সঙ্গে ওমের সম্পর্ক কি?

বেল্-চেম্বার আমাদের দীর্ঘদিনের শত্রু। আমার দাদাকে ও কিড্ন্যাপ করেছে। এই অ্যাটাচিটা হল দাদার মুক্তিপণ। এর ভেতরে যা আছে তা পেলেই ছেড়ে দেবে ও।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব! আজ থেকে দশ বছর আগে যে লোক জেল ভেঙে পালাতে গিয়ে জেলরক্ষীদের গুলিতে মারা গেছে, সে কি করে তোর দাদাকে গুম করবে নীতা! আমার মনে হয় কোথাও তোদের মস্ত একটা ভুল হচ্ছে।

মরা চাঁদের মতো ম্লান মুখে একটু হাসল নীতা। তারপর বলল—বেল্-চেম্বার মারা যায় নি অম্বরদা।

ইম্পসিবল্। পুলিশ রিপোর্ট বলছে সে মারা গেছে।

সবাই তা জানে। আমরাও তাই জানতাম। কিন্তু পুলিশ রিপোর্টে বেল্-চেম্বার মৃত বলে ঘোষিত হলেও ও মরে নি। ওর মৃত্যু নেই। ও কখনো পাকিস্থানে কখনো নেপালে গা ঢাকা দিয়ে থাকে।

আর মাঝে মধ্যে এখানে এসে আমাদের মতো কিছু লোককে জ্বালাতন করে।

বেল্-চেম্বারের নামে আমার কপালে ঘাম দেখা দিল। রাগে ফুলে উঠল রগের শিরাগুলো। কলকাতার রিপন ষ্ট্রীটের একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান পরিবারের এক বিপথগামী যুবক বেল্-চেম্বার। ছুরি ডাকাতি স্মাগলিং খুন কিছুই ওর পক্ষে কঠিন নয়। এক সময় কলকাতার বাঘা বাঘা পুলিশকেও ঘামিয়ে তুলেছিল সে। একবার মেট্রো সিনেমার সামনে এক সিন্ধি দম্পতিকে খুন করার অভিযোগে বহু চেষ্টার পর পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে তার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। এসব বছর দশেক আগেকার কথা। সেই সময় কিছু দুষ্কৃতকারী জেল ভেঙে পালাতে গেলে জেলরক্ষীরা গুলি চালায়। বেল্-চেম্বার সেই সময় রক্ষীদের গুলিতে মায়া গেছে বলেই জানত সবাই। কিন্তু এতদিন পরে হঠাৎ তার এই আবির্ভাব অপরাধ জগতে এক অশনি সংকেত ছাড়া কিছুই নয়। যাই হোক। কথা না বাড়িয়ে নীতার কাছ থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—এতে কি আছে রে?

নীতা চুপ করে রইল।

বল আমাকে।

দাদার মুক্তিপণ।

সে তো জানি। কিন্তু এর ভেতরে কি আছে বলবি না? আমার কাছে কিছু লুকোস না নীতা। তোদের ভালোর জন্যই বলছি।

নীতা তবুও নীরব। ভয়ে বিব্রত বোধ করতে থাকে। কি যেন বলি বলি করে কিন্তু বলিতে পারে না।

কোন ভয় নেই। তোর গোপনীয়তা আমি রক্ষা করব। তোর এই দাদাটার উপর সেটুকু ভরসা অন্তত রাখতে পারিস।

জলমগ্ন ব্যক্তি যেভাবে অন্যের সাহায্য চায় নীতা ঠিক সেই ভাবেই বলল এবার—অম্বরদা! আমার দাদাকে বাঁচান।

আমি সান্ত্বনার সুরে বললাম—আরে বোকা মেয়ে বাঁচাব বলেই তো এসেছি আমি। নাহলে কে আসত এই ভর দুপুরে ?

আপনি পুলিসে খবর দেবেন না তো ?

না। পুলিসের সঙ্গে আমার কাজকর্ম হয় ঠিকই তবে সব ব্যাপার আগে ভাগে আমি পুলিশকে জানাই না। তাতে অনেক পাকা ঘুঁটি কেঁচে যায়।

এই অ্যাটাচিতে আমার মায়ের অনেক দামী দামী গয়না আছে। আর আছে দশ হাজার টাকা।

হুম। এইটা আমাকে নিয়ে যেতে হবে। এই তো ? তা তোর দাদাকে বেল্-চেম্বার কোথায় কিভাবে ধরল কিছু অনুমান করতে পারিস ?

পারি। দাদা একটা দরকারি কাজে বরাকর গিয়েছিল। মনে হয় সেখানেই ওর খপ্পরে পড়ে যায়।

বেল্ কি ঐ অঞ্চলে ঘাঁটি গেড়েছে ?

তা কি করে জানব বলুন ? তবে ঐ অঞ্চলে এবং রাজারাপ্পার জঙ্গলেই মাঝে মধ্যে দেখা যায় ওকে।

আমি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে এক মনে ব্যাপারটা ভালে করে বোঝ-বার চেষ্টা করলাম।

নীতা বলল—আপনার ট্রেনের সময় হয়ে আসছে অম্বরদা। আপনি কোলফিল্ডে যাবেন তো ?

না, আরো একটু দেরী করে কালকায় যাবো। কিন্তু নীতা, আমার যে আরো কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে ?

নীতা ঘামছে। ঘামবে নাই বা কেন ? কতই বা বয়স ওর। তেরো কি চৌদ্দ। এখনো ফ্রক পরে। ভয়ে ফ্যাকাসে মুখে আঠা জড়ানো গলায় বলল—বলুন, কি জানতে চান ?

তোর বাবা তো দীর্ঘদিন কলকাতার বাইরে আছেন। এই সময় ওমের এমন কি কাজ পড়ল বরাকর যাবার ? বিশেষ করে তোকে একলা এই বাড়িতে রেখে ? ওমের মুক্তিপণ চেয়ে বেল্-চেম্বারই যে

টাকাটা দাবী করেছে তারই বা প্রমাণ কি ? আর·····।

আর কি জানতে চান বলুন।

আর অত টাকা ওম চাওয়া মাত্র তুই-ই বা পেলি কোথায় ?

নীতা এবার ধপ করে সোফার ওপর বসে পড়ল। তারপর বলল —বলব বলব। সব কথা খুলে বলব আপনাকে। আর না বলে উপায় নেই। আপনাকে না জানালে ওদের এই জাল থেকে আমরা কিছুতেই কেটে বেরতে পারব না।

আমি সস্নেহে নীতাকে বললাম—দেখ নীতা, আমার বোন নেই। তুই আমার বোনের মতো। শুধু বোনের মতো কেন, একমাত্র বোন। তোদের পরিবারের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের যোগাযোগ। কাজেই তোদের কোন বিপদ হলে আমি জীবন দিয়ে লড়ব। পেশাদার না হলেও গোয়েন্দাগিরিতে আমার যথেষ্ট সুনাম আছে। থানা পুলিশও সেই সূত্রে হাতের মুঠোয়। এখনো হয়ত কিছু করা যাবে। খুলে বলতো ব্যাপার কি ?

নীতা বলল—অম্বরদা, আপনি তো জানেন আমার বাবা একটি পেট্রল পাম্পের মালিক। এবং বাবা বছরের প্রায় বেশিরভাগ সময়ই এখানে ওখানে ঘোরেন। আসলে বাবার এই ব্যবসাটা ছাড়াও অন্য একটা ব্যবসা আছে।

কি সেই ব্যবসা ?

একটু চুপ করে থেকে নীতা বলল—আমার বাবা একজন জুয়েল থিপ। পাকা স্মাগ্‌লার। কেউ তা জানে না। হীরের চোরা চালানে আমার বাবার·····।

কথা শেষ হবার আগেই একটু অস্ফুট আর্তনাদ করে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়ল নীতা। চোখের পলকে দালানের জানলার দিক থেকে একটা বুলেট এসে ওর মাথাটাকে চুরমার করে দিয়েছে।

আমি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলাম ওধারে। গিয়ে দেখলাম ভেতরের দরজায় শিকল দেওয়া। অতএব পাশের ঘরে ঢুকে আর একটি দরজা খুলে যখন ওধারে পৌঁছলাম পাখি তখন ফুড়ুৎ। শুধু সদ্য খাওয়া

কয়েকটি পোড়া সিগারেটের টুকরো, ভারী বুটের ছাপ আর একটা লাল কালির ডট্ পেন ছাড়া কিছুই নেই। এর প্রত্যেকটাই আমার কাজে লাগবে। সিগারেটের টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে একটা কাগজে মুড়ে পকেটে রাখলাম। তারপর জুতোর ছাপগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করলাম। ঐ ছাপ পুলিসে নেবে। আর এই ডট্ পেনটা ··। হ্যাঁ, এটাই খুব বেশি কাজে লাগবে আমার।

আমি নীতার কাছে এলাম।

ওর এই শোচনীয় মৃত্যু দেখে আমার দু'চোখে জল এলো। ও যে আমার বোন। একটি মাত্র বোন পেয়েছিলাম তাকেও হারালাম। এ দুঃখ কি কম? আর কোন ভাইফোঁটায় ওর ঐ শুভ্র সুন্দর মুখে নির্মল জোছনার মতো হাসি দেখতে পাবো না। ওর হাতের ঐ চম্পাকলির মতো আঙ্গুলের ফোঁটা আমার কপালে আর কখনো চাঁদ আঁকবে না। আমার বুকটাকে খালি করে চলে গেল ও।

ওর সারা মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে।

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে কতকটা যেন নিজের মনেই বললাম, 'এই হত্যার প্রতিশোধ আমি নেবোই নীতা। যদি এই হত্যাকারীকে আমি ধরতে না পারি তাহলে জেনে রাখিস এই আমার শেষ গোয়েন্দাগিরি।'

নীতাদের বাড়িতে টেলিফোন ছিল।

আমি রিসিভার তুলে ডায়াল ঘুরিয়ে ফোন করলাম—হ্যালো, পুলিশ স্টেশন! হ্যালো! অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং···।

ওয়ান আপ দিল্লি কালকায় এম.জি.এস কোচে রান করছি। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ট্রেনটা যেন উল্কার বেগে ছুটছে। ছোটার গতিতে অসম্ভব দুলছে ট্রেন। এক এক সময় মনে হচ্ছে ট্রেনটা দুলুনির চোটে এক্ষুনি বুঝি ছিটকে পড়বে লাইন থেকে।

আমার হাতে নীতার দেওয়া অ্যাটাচিটা আছে। ওটা বেশ শক্ত করেই ধরে রেখেছি আমি, কেননা আমার এই যাত্রার কারণে এইটাই

সব চেয়ে মূল্যবান।

ট্রেনের দুলুনিতে দুলে দুলে বার বার নীতার কথাই মনে পড়ছিল আমার। কি সুন্দর ফুলের মতো মুখ। অমন পবিত্র নিষ্পাপ কচি মুখ খুব কমই দেখেছি আমি। ওর ভদ্র সভ্য মার্জিত ব্যবহার আমাকে দারুণ মুগ্ধ করেছিল। কিন্তু নিঠুর নিয়তি অকালেই ঝরিয়া দিল তাকে। একটু আগেও জানতে পারিনি বিধাতাপুরুষ অমন নির্মম পরিহাস করবেন বলে। মৃত্যুরূপী মহাকাল যে অতি সন্তর্পণে এসে এক লহমায় আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে ওকে তা কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। নীতার সেই অস্ফুট আর্তনাদ, ওর সেই লুটিয়ে পড়া, রক্তে ভাসা মুখ বার বার মনে পড়ল আমার। একটা প্রতিশোধের স্পৃহা আমার মনের মধ্যে এমনভাবে তোলপাড় করতে লাগল যে উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম আমি।

ট্রেন ছুটছে। স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যাচ্ছে। মনকে শক্ত করে ধৈর্য ধরে তবুও বসে রইলাম। কেননা এখুনি আমার ভেঙে পড়লে চলবে না। ওমকে বেলের খপ্পর থেকে উদ্ধার করতেই হবে। তারপর টুঁটি ধরে টেনে আনব নীতার হত্যাকারীকে। ট্রেনে ওঠার আগে একবার ভেবেছিলাম ওমের ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে আসি। কিন্তু ভেবেও তা করলাম না। কারণ দৃশ্যপট স্টেটের বাইরে। ওখানকার পুলিশকে জানালেও বিশেষ কিছু সুবিধে হোত না। তাছাড়া ঐ ব্যাপার নিয়ে পুলিশ হয়তো কাজ দেখাবার জন্য চারিদিক তোলপাড় করে অযথা এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসত যা ওমের মুক্তির ব্যাপারে খুবই ক্ষতিকর হোত। তাই কোনরকম ঝুঁকি না নিয়েই শুধুমাত্র সাহসে ভর করেই এগিয়ে এলাম এই কাজে।

মধ্যরাতে ধানবাদে নেমে গোলার মোড়ে যাবার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলাম না। গোলা যে কোথায় কতদূরে তা জানা ছিল না। অনুসন্ধানে জানলাম গোলা এখান থেকে নব্বুই কিলোমিটারেরও বেশি পথ। এই রাতে ঐ পথে যাবার কোন পরিবহনই নেই।

হতাশ হয়ে স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ফিরে আসতে যাচ্ছি তখন হঠাৎ

একটি ট্রাকের সন্ধান মিলল। সেটা যাচ্ছিল রামগড়ের দিকে। হাজারীবাগ জেলার একটি প্রসিদ্ধ স্থান রামগড়। কয়লা খনি অঞ্চলের জন্যও গোলা বিখ্যাত। যাই হোক ড্রাইভারকে গোটা কুড়ি টাকা 'রসগুল্লা খানেকে লিয়ে' দিতেই ড্রাইভার আমাকে তার পাশে বসিয়ে নিয়ে যেতে রাজি হল।

আমি উঠে বসতেই ট্রাক ছাড়ল।

ঝড়ের গতিতে রাতের অন্ধকারে ছুটে চলল ট্রাক। এই অঞ্চলে চারিদিকে বন পাহাড় আর পথের ধারে অগণন কয়লাখনি। বিহারের এই অঞ্চলের তাই এত নাম ডাক। চারিদিকে আগুন আর কালো কয়লার ধোঁয়া।

কাঁচা কয়লা পুড়ছে কত। এক জায়গায় দেখলাম আলোয় আলো চারিদিক।

ড্রাইভার বলল—রাস্যো ইন্দো ভেঞ্চার।

মানে ?

বোখারো ইসপাত কারখানা। দেখছেন না কি দারুন শিল্প যজ্ঞ চারিদিকে। যেন অলকাপুরী।

ট্রাক বোখারোর সীমানা ছাড়িয়ে আরো অনেকদূর গিয়ে এক জায়গায় থামল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কি হল! থামলে যে ?

গোলার মোড়ে নামবেন যে আপনি ? এই তো এসে গেছেন।

জায়গাটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা।

ড্রাইভার বলল—এত রাতে কোথায় যাবেন ?

কোথাও না। এইখানেই আমার দরকার।

বেশ নামুন তবে। এই দেখুন ডানদিকের পথটা চলে গেছে রাজারাপ্পায় আর বাঁদিকের পথ রামগড় হয়ে রাঁচীতে। এখন আপনার যেখানে মন চায় যান।

আমি ড্রাইভারকে ধন্যবাদ জানিয়ে সেই ঘন অন্ধকারে অ্যাটাচিটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম সাহসে ভর করে।

মোটর বাইকটা ঠিক আমার সামনে এসে থামল

জায়গাটা ঠিক কি রকম তা বুঝতে পারলাম না। তবে চারদিকে বেশ বড় বড় গাছপালা আছে বুঝতে পারলাম। স্থান নির্জন হলেও মাঝে মধ্যে দু'চার মিনিট অন্তরই প্রায় দ্রুতগতি ট্রাকের আনাগোনাও আছে। তাড়াতাড়িতে টর্চটা আনতে ভুলে গেছি। তাই কোনদিকে যে কি আছে কিছুই ঠাহর করতে পারলাম না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর একটা ভট ভট শব্দ আমার কানে এলো। শব্দটা আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ করে তুলল যেন। গা-টা শির শির করতে লাগল।

একটু সন্ধানী দৃষ্টি। তারপর একটা মোটর বাইকের হেড লাইটের আলো রোডের ওপর দেখতে পেলাম। সেই সঙ্গে ভট ভট ভট ভট।

বাইকটা ঠিক আমার সামনে এসে থামল।

বাইকে একজন বলিষ্ট চেহারার কালো পোশাক পরা লোক বসে-ছিল। কোন রকমেই তার মুখ দেখে বোঝবার উপায় ছিল না সে কে।

আগন্তুক আমার দিকে মুখ করে বলল—আর ইউ রিপ্রেজেণ্টেটিভ অব মিঃ মাকিন ?

ইয়েস মিঃ বেল্-চেম্বার।

ননসেন্স্। বেলচেম্বার হ্যাজ বিন ডেড টেন ইয়ার্স এগো। আয়্যাম জন হেণ্ডরিক। লিডার অব মাই পার্টি।

আমার হাতটা তখন ধীরে ধীরে পকেটের ভেতর ঢুকছিল।

আগন্তুক বলল—ডোণ্ট টাচ্ এনিথিং ইন ইয়োর পকেট জেণ্টল্-ম্যান। আপনার পকেটে যে জিনিস রাখিয়াছেন ও জিনিস হামার পকেটেও আছে। তাহাড়াও এই অন্ধকারে হামার আরো দুইটি লোক পিস্তল রেডি করিয়া তাকাইয়া আছে আপনার দিকে। ইফ ইউ ডিস্টার্ব মি, ও লোক গোলি করিয়া ডিবে। প্লিজ গিভ মি দ্যু অ্যাটাচি অ্যাণ্ড গো ব্যাক স্থন।

আমি অ্যাটাচিটা এগিয়ে দিতে দিতে প্রশ্ন করলাম—বাট হোয়্যার ইজ মাই ফ্রেণ্ড ?

উত্তর এলো—আই ডোণ্ট নো।

আগন্তুক হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়েই বাইকে স্টার্ট দিল।

আমিও অমনি হিতাহিত ভুলে পিছন দিক থেকে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম তার ঘাড়ে। সেই মুহূর্তে আমি ভুলে গেলাম আমার পিছন দিকে পিস্তল উঁচিয়ে থাকা আরো দুজন লোকের কথা। তবে এটুকু বুঝলাম এই অবস্থায় গুলি চালাতে কিছুতেই সাহস করবে না ওরা।

শুরু হল প্রচণ্ড ধস্তাধস্তি।

কী অমানুষিক শক্তি ওর গায়ে।

আমাকে এক ঝটকায় ফেলে দিয়ে বাইক নিয়ে পালাল সে। আমি পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

তবুও হাল না ছেড়ে শুয়ে শুয়েই দু'হাতে অটোম্যাটিকটা শক্ত করে ধরে পলাতকের উদ্দেশ্যে গুলি ছোটাতে লাগলাম।

প্রথম দুটো ফসকে গেলও তৃতীয়টা ফসকালো না। দূর থেকে 'আঃ' করে একটা আর্তনাদ আমি শুনতে পেলাম।

এমন সময় আমার মাথার ওপর দিয়ে সশব্দে একটা বুলেট ছুটে গেল।

এতক্ষণ আমি ভুলেই গিয়েছিলাম ঐ দুজন লোকের কথা। যারা নাকি আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে।

আমি চোখের পলকে শোল মাছের মতো পিছলে অন্ধকার খাদে নেমে গেলাম। তারপর পিছু হটে নিজেকে নিরাপদ করলাম একটা গাছের আড়ালে গিয়ে। তবে যাবার আগে 'আঃ' করে মিথ্যে একটা আর্তনাদ করে যেতেও ভুললাম না। যাতে ওরা মনে করতে পারে ওদের গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি।

এমন সময় ঝড়ের বেগে রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ট্রাক অন্ধকার বিদীর্ণ করে হারিয়ে গেল।

তারপরেই দেখলাম দুজন লোক রাস্তায় নেমে এসে টর্চের আলোয় কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

বুঝলাম আমাকেই খুঁজছে ওরা।

আমার আর্তনাদ ওদের কানে গেছে। তাই ওরা আমার হত বা আহত শরীরটাকে একবার দেখতে চায়।

এমন সময় অপর দিক থেকে আসা আরো একটি দ্রুতগামী ট্রাকের হেডলাইট ওদের গায়ে পড়তেই সুবিধে হল আমার। আমি সেই গাছের আড়াল থেকে অবর্থ লক্ষ্য ভেদে ওদের দুজনের জন্য দুটি গুলি খরচ করলাম। দুটি গুলিই ওদের অসতর্কতার জন্য ঠিক বুকের মাঝ-খানে গিয়ে লাগল ওদের।

দুজনেই লুটিয়ে পড়ল পথের ওপর।

এদিকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসা সেই ট্রাকও গতিক সুবিধের নয় বুঝে গতিবেগ একটুও না কমিয়ে ডেডবডির ওপর দিয়েই চালিয়ে দিল।

সে এক বীভৎস দৃশ্য।

অমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। দেখে গা শিউরে উঠল আমার। নরকেও এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখা যায় না বুঝি। রাস্তার বেওয়ারিস কুকুরগুলো চাপা পড়লে যেমন পিচের ওপর থেঁতলে যায় ঠিক সেই ভাবেই ওদের মুখ দুটো থেঁতো হয়ে পিচে কামড়ে একাকার হয়ে গেছে।

আমি কোন রকমে ওদের দেহ দুটো টেনে রাস্তার পাশে খাদে নামালাম। তারপর ওদের দুজনের দুটো রিভলভার আর টর্চ সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার শিকারের দিকে। নিশ্চয়ই পথের ধারে কোথাও বাইক নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে সে।

আমি টর্চ না জ্বেলে অন্ধকারেই গাছপালার আড়ালে আড়ালে এগোতে লাগলাম।

এখানে পথের দুপাশে বন জঙ্গল পাহাড় বা ফাঁকা মাঠ কি যে আছে তা ঠিক বুঝতে পারছি না। চারিদিকেই অন্ধকার আর অন্ধকার।

এই অন্ধকারে অভিযান করতে গিয়ে বার বার বেচারি নীতার কথা মনে পড়তে লাগল আমার।

বেলের দুজন লোক নিহত হলেও আসল লোককে তো ধরতে পারলাম না।

আর ওম ! যাকে উদ্ধার করতে এখানে আসা সে-ই বা কোথায় ?

পাছে ওমের কোন ক্ষতি হয় সেই ভয়ে আমি পুলিশকে পর্যন্ত কিছু না জানিয়ে এখানে এসেছিলাম। কিন্তু যে ভয় করলাম তাই হল। অর্থাৎ আমি অনেক বুদ্ধি ধরেও বেলচেম্বারের বুদ্ধির প্যাঁচে চমৎকার-ভাবে প্রতারিত হলাম। মন মেজাজ দারুণ খিঁচড়ে গেল। রাগে দুঃখে ক্ষোভে নিজের মাথার চুল নিজেরই ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করল। কেন যে অমন বোকামি করলাম ? অথচ এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিল।

আমি বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে আসার পরও সেই মোটর বাইক কিংবা আহত কাউকেই দেখতে পেলাম না। তবে এখানে এক জায়গায় বড় বড় কয়েকটি পাথরের আড়াল রয়েছে দেখলাম। যেখানে স্বচ্ছন্দে আত্মগোপন করা যায়।

আমি এই রকমই একটি পাথরের আড়াল বেছে নিয়ে টর্চের আলোয় চারিদিক দেখতে লাগলাম।

না। কোথাও কিছু নেই।

তবুও প্রত্যাশিত আক্রমণের জন্য তৈরী হয়ে এক হাতে অটোম্যা-টিকটা শক্ত করেই ধরে রইলাম। বলা যায় না আমার গুলিতে বেল যদি সত্যিই না মরে থাকে তাহলে আহত সিংহ সে। আমার জন্য সে অপেক্ষা করবেই। এবং অলক্ষ্য হতে আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে একটুও দ্বিধা বোধ করবে না সে।

যা ভাবলাম তা অবশ্য ঘটল না যদিও তবুও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আমি সেই বড় বড় পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে টর্চের আলোয় চারিদিক লক্ষ্য করতে করতে এগোতে লাগলাম।

হঠাৎ টর্চের আলোয় এক জায়গায় কিছু রক্তের দাগ আমার চোখে পড়ল।

সেই দাগ লক্ষ্য করে একটু এগোতেই দেখলাম আমার আনা সেই অ্যাটাচিটা এক পাশে পড়ে আছে। আর তার পাশেই গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে ওমপ্রকাশ। রক্তে ওর সারা শরীর ভেসে যাচ্ছে।

আমি ছুটে গিয়ে ওর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে ডাকলাম—ওম !

কোন সাড়া পেলাম না।

গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম গা একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা। প্রাণহীন নিস্পন্দ দেহ নিথর শীতল।

আমার সব যেন কি রকম গোলমাল হয়ে গেল।

অ্যাটাচিটা চাবি সমেত পড়েছিল। তাড়াতাড়ি সেটা খুলে যা দেখলাম তা দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলাম না। দেখলাম বহুমূল্য একটি হীরের নেকলেস সহ কিছু সোনার গহনা ও কয়েক বাণ্ডিল টাকা রয়েছে তাতে। যা আমি ওমের মুক্তিপণ হিসেবে অতদূর থেকে বয়ে এনেছিলাম।

এখন রহস্যটা এই, ওমের হত্যাকারী কে?

বাইক চেপে আমার কাছ থেকে অ্যাটাচিটা আনতে কি ওমই গিয়েছিল ছদ্মবেশে?

ওম কি তাহলে আমারই গুলিতে মৃত্যুবরণ করেছে? নাকি স্বয়ং বেল্ চেম্বারই ওমের হত্যাকারী? তা যদি হয় ওমের হাত থেকে ঐ অ্যাটাচিটা নিয়ে যেতেই বা সে ভুলল কেন?

আমার প্রথম চিন্তাটা অবান্তর। কেননা ওম ছদ্মবেশে আমার কাছে কিসের স্বার্থে যাবে এবং কেনই বা যাবে?

আমি গুলি করেছিলাম পিছন দিক থেকে। কিন্তু ওমের আঘাত বুকে।

তাছাড়া আমার গুলির আঘাতে ওমের মৃত্যু হলে বাইকটাও কাছাকাছি পড়ে থাকত।

এখন ভাবা যেতে পারে ওম কোন রকমে বেলের খপ্পর থেকে নিজেকে উদ্ধার করে এখানে এসে লুকিয়ে থাকে এবং আমার গুলিতে আহত বেল্ এই পথে আসার সময় ওম তাকে আক্রমণ করে অ্যাটাচিটা ছিনিয়ে নেয়। এই সময়ই বেলের গুলিতে ওম নিহত হয়। কিন্তু ওমের আঘাতে বেল্ এমনই আহত হয় যে এখান থেকে পালাবার সময় এই অ্যাটাচিটা নিয়ে যাবার মতো মনোবলও সে হারিয়ে ফেলে। অথবা এর ভেতরে যা কিছু আছে তা সবই নকল। আবার এও হতে

পারে হয়তো অদূরেই কোথাও বেলের মৃতদেহ পথের ধারে পড়ে আছে।

যাই হোক। আমি নিজেকে বিপন্ন করবার জন্য আর এই অচেনা জায়গায় অযথা অনুসন্ধান করতে না গিয়ে নিকটবর্তী থানায় আমার পরিচয় পত্র দেখিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করলাম। তারপর অ্যাটাচিটাও জমা দিয়ে ভোর বেলা রাঁচী হয়ে ফিরে এলাম কলকাতায়।

বাড়ি ফিরেই আমি পুলিসের সাহায্য নিয়ে সর্বপ্রথম নীতাদের মার্বেল প্যালেসে গেলাম। রাতারাতি একটি পরিবার যে কি ভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় এই প্রথম প্রত্যক্ষ করলাম আমি। এই সাদা বাড়ি যে একদিন কালো অন্ধকারে ঢেকে যাবে তা কে জানত?

নীতাদের বাড়ি এখন পুলিশের হেফাজতে।

পুলিশ তালা খুললে বাড়িতে প্রবেশ করলাম।

এরপর অনুসন্ধিৎসু চোখে তন্ন তন্ন করে চারিদিক খুঁজতেই এক সময় পেয়ে গেলাম আমার ঈপ্সিত বস্তুটি। অর্থাৎ নীতার ডায়েরীটা যেটা এই বছরই আমি আমার প্রীতির নিদর্শন স্বরূপ উপহার দিয়েছিলাম নীতাকে।

সোফায় বসে ডায়েরীর পাতাগুলো ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে এক জায়গায় এসে থেমে গেলাম।

প্রবল উত্তেজনায় কপালে ঘাম দেখা দিল আমার।

নীতা লিখেছে··বাবা তো চিরকালই ঐরকম। অত ভালো-মানুষ তবু যে কেন ঐ সব করে বেড়ান তা জানি না। আমাদের কি টাকার অভাব আছে?

এতদিন জানতাম বেল্‌-চেম্বার মরে ভূত হয়ে গেছে। কিন্তু এখন শুনছি সে জীবিত। তাহলে উপায়? ওর মৃত্যু সংবাদ কি তাহলে ভুল প্রচারিত হয়েছিল? দাদার মুখে শুনলাম বেল্‌ নাকি আমাদেরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখন জন হেনড্‌রিক নাম নিয়ে আবার ফিরে এসেছে। রাজায়াপ্পার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছে সে।

এরপর আবার কয়েকটি পাতা উল্টে এক জায়গায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম।

বেল্ আমাদের চিরশত্রু। শয়তানটাকে আমি একদম সহ্য করতে পারি না। আমি যখন খুব ছোট ছিলাম তখন একবার ও আমাকে দুদিন লুকিয়ে রেখেছিল। ওঃ, সে কি কষ্ট।

তারপর প্রচুর অর্থ এবং বাবার স্মাগলিং বিজ্‌নেসের পার্টনার-শিপের বিনিময়ে আমাকে মুক্তি দেয়। বেলের মৃত্যুসংবাদ প্রচারিত হবার পর ভেবেছিলাম বাবা হয়তো একটু শোধরাবেন। কিন্তু না, দিনের পর দিন বাবা আরো বেশি অর্থ-লোলুপ এবং আরো অসামাজিক কাজে লিপ্ত হতে লাগলেন। অথচ দাদা কত ভালো। কিন্তু ইদানিং দাদাকেও আমার সন্দেহ হচ্ছে। দাদা কেন যে জেনে শুনে বেলের এলাকায় যায়? তবে কি··· ?

আর একটি পাতায় লেখা আছে···ইদানিং অম্বরদার এই বাড়িতে আসা যাওয়াটা বাবা খুব একটা ভালোর চোখে দেখছেন না। যেদিন থেকে অম্বরদা গোয়েন্দাগিরি সুরু করেছেন সেদিন থেকেই বাবা অম্বরদাকে এড়াতে চাইছেন। অম্বরদার সঙ্গে বেশি কথা কইলে বাবা আমাকেও বকেন। বাবার ধারণা আমি হয়তো কথায় কথায় আমাদের গুপ্তকথা অম্বরদাকে বলে ফেলব। অথবা অম্বরদা কথার প্যাঁচে আমার পেট থেকে কথা বার করে নেবেন। এত সোজা? উনি যতই কেন আমাদের আপনজন হোন না, তবুও আমি কি এমন কাজ করতে পারি যাতে অম্বরদা বাবার হাতে হাতকড়া পরান?

ডায়েরীর পাতায় আর এক জায়গায় লেখা আছে···দাদা আজ নিজের থেকেই বলল, আমি ভেতরে ভেতরে চেষ্টা করছি বেলের দলে ভেড়বার। কেননা ওকে সরাতে না পারলে বাবাকে কনট্রোল করা যাবে না। বেল্-চেম্বার জেল রক্ষীদের গুলিতে মরেনি বাবা এ কথা জানতেন। কিন্তু আমাদের কাছে প্রকাশ করেন নি কখনো। যাই হোক, বেলকে আমি নিজে হাতে খুন না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছি না।

ডায়েরীর যে অংশটার ওপর এইবার আমার নজর পড়ল তা আরো গুরুত্বপূর্ণ। নীতা লিখেছে—

ইদানিং দাদা খুব বিমর্ষ। প্রায়ই বলে আমরা একটা চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ছি নীতা। ভাবছি একবার অম্বরকে সব কথা খুলে বলি। আমাদের এই দারুণ বিপদে একমাত্র ঐ হয়তো সাহায্য করতে পারে। কিন্তু বাবার মুখ চেয়ে পারছি না। কেননা এই পাপচক্রে বাবা এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছেন যে বাবাকে বাঁচানোর কোন রাস্তাই আর নেই। অথচ বাবার কিছু হওয়া মানেই আমাদের এই প্রতিপত্তি সব কিছুর ধ্বংস হয়ে যাওয়া। এক এক সময় ভয় হয় বেল্ বাবাকেই না খুন করে। তবে ও যে আমাদের ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করছে তা বেশ বুঝতে পারছি। তাই একটা অ্যাটাচিতে কয়েকটি নকল গয়না ও কিছু জাল নোট রেখে দিলাম। বেল্ হয়তো কোন না কোন সময়ে হয় তোকে নয়তো আমাকে গুম করে কিছু মুক্তিপণ চেয়ে বসবে। আমি মনে প্রাণে চাইছি ঐ ভুলই ও করুক। যদি তোকে সরায় তাহলে ওর মোকাবিলা আমিই করব। আর যদি আমাকে সরায় তাহলে সোজা অম্বরের হাতে এই অ্যাটাচিটা তুলে দিয়ে সব কথা খুলে বলবি ওকে। ও নিশ্চয়ই তার পরের কাজটা খুব সুসংহত-ভাবেই করবে এবং আসন্ন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে আমাদের।

এরপর ডায়েরীতে অনেক কিছুই লেখা ছিল।

সেগুলো অপ্রাসঙ্গিক। আমার কোন কাজে লাগবে না। শুধু এইটুকুই বুঝতে পারলাম ওমপ্রকাশ দুঃসাহসীকতার জন্যই বেল্-চেম্বারের ফাঁদে পা দিয়ে ওর খপ্পরে পড়ে। তারপর ওদেরই সাহায্য নিয়ে পূর্ব পরিকল্পনা মতো নীতাকে এবং আমাকে ফোন করে।

আমি মুক্তিপণ নিয়ে যাই।

সম্ভতঃ এই মুক্তিপণ নিতে আসবার সময়ই সংঘর্ষ বাধে। এবং তখনই বেল হত্যা করে ওমকে। নাহলে ওমকে আমার হাতে তুলে দিয়েই বেল তার মুক্তিপণ আদায় করত। পরে আমার কাছ থেকে

মুক্তিপণ নিয়ে ফেরার সময় আমার আক্রমণের আঘাতে সে বুঝতে পারে আমরা ওর মোকাবিলার জন্য তৈরী। অতএব অ্যাটাচির মধ্যে যা কিছু আছে তা আসল নাও হতে পারে। এবার সে ঐ পাথরের আড়ালে এসে ভেতরের জিনিসগুলো পরীক্ষা করে দেখে এবং ভুয়া মাল বুঝতে পেরেই ফেলে দিয়ে চলে যায়।

এ সবই অবশ্য আমার অনুমান। কেননা এ ছাড়া আর কোন্ সিদ্ধান্তেই বা আসতে পারি আমি?

এ তো গেল একদিক।

কিন্তু বেল্! বেলের কি হবে?

জেল পলাতক এই নৃসংশ কয়েদী একবার পালিয়ে বাঁচলেও বার বার কি সে অপরাধ করে পার পাবে? না। তা হয় না। হতে পারে না। এবং আমার মনে হয় এবারে সে বেশিদূরে পালাতেও পারবে না। তার কারণ আমার গুলির জবাবে যে করুণ আর্তনাদ তার শুনেছি তা অভিনয় নয়। প্রাণে না মরলেও বেশ ভালো রকমই জখম সে হয়েছে। অতএব গুলি বিদ্ধ অবস্থায় ডাক্তার বা হাসপাতালের শরণ তাকে নিতেই হবে।

কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, নীতার হত্যাকারী কে?

নীতার মৃত্যুর সঙ্গে বেলের কি সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে? আমার তো মনে হয় না।

তবে কে? কে নীতার হত্যাকারী?

পুলিশ জোর তদন্ত চালাচ্ছে নীতার হত্যাকারীকে ধরবার জন্য।

আমিও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

যে ভাবেই হোক, নীতার হত্যাকারীকে আমি খুঁজে বার করবই।

এই ঘটনার প্রায় এক মাস পরের কথা।

পুলিসের ফোন পেয়ে সোজা চলে এলাম মার্বেল প্যালেসে।

কুন্দন প্রকাশ মাকিন ফিরে এসেছেন। সেই বুদ্ধিদীপ্ত কথা বলিষ্ঠ মানুষটির আজ এ কি দশা। দেখে চেনবারও উপায় নেই। হতাশ হয়ে সোফায় গা এলিয়ে পড়ে আছেন।

স্ত্রী গত হয়েছেন বহুদিন।

দুটি মাত্র সন্তান। দুর্ভাগ্য তাদের দুজনকেই ছিনিয়ে নিয়েছে আজ। নিয়তির পরিহাসে আজ তিনি সর্বহারা।

আমি আগের মতোই কাছে এসে বললাম—কাকাবাবু! সব শুনেছেন তো? এত দেরি করে এলেন কেন আপনি?

একটা অবরুদ্ধ কান্না যেন বুক ফেটে বেরিয়ে এলো কুন্দন প্রকাশের। ঐরকম একজন মানুষ যে কাঁদতে পারেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বললেন—কি থেকে কি হয়ে গেল আমার। ওমকে হারালাম। নীতাকে হারালাম। কিন্তু এভাবে যে হারাব তা আমি ভাবতেও পারিনি। শয়তান বেল্ আমার সর্বনাশ করে চলে গেল।

তারপর একটু থেমে বুকের দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন কুন্দন প্রকাশ। আমার চোখের দিকে চোখ রেখে বললেন—পারবে? পারবে তুমি ঐ শয়তানটাকে ধরতে? শুধু তুমি নয় যে পারবে, আমার ছেলে মেয়ের হত্যাকারীকে যে ধরে দিতে পারবে তাকেই আমি আমার যথা-সর্বস্ব দিয়ে দেবো।

আমি আমার সঙ্গে আসা পুলিশের লোকেদের বললাম—আপনারা যান। মিঃ মাকিনের সঙ্গে আমার একটু ব্যক্তিগত কথাবার্তা হবে।

ওরা চলে গেলে কুন্দন প্রকাশকে বললাম—যদি আমিই ধরে দিই সেই হত্যাকারীকে, তাহলে?

তাহলে তোমাকেই দেবো। তাছাড়া তুমি তো আমার ছেলের বন্ধু। নীতার দাদা। এখন তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো? হত্যাকারী ধরা পড়লেই আমি সব তোমার নামে লিখে দিয়ে এখান থেকে চলে যাব।

সেকি!

হ্যাঁ। এই বাড়িতে আর আমার মন টিকছে না। ওদের

হারিয়ে আর আমি কিছুতেই থাকতে পারছি না এ বাড়িতে। এখানকার সর্বত্রই যে ওদের স্মৃতি মাখা।

আমি ম্লান হেসে বললাম—তা অবশ্য ঠিক। এখানে আর থাকা যায় না।

এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

এ বাড়িতে আজকাল আপনি এমনিতেই তো খুব কম থাকতেন, তাই না?

হ্যাঁ। ব্যবসার কাজে আমাকে সব সময় বাইরে বাইরে থাকতে হোত।

কিসের ব্যবসা আপনার?

পেট্রলের। কেন, আমার পেট্রল পাম্প তুমি দেখনি?

শুধুই কি পেট্রলের? তার সঙ্গে আর কিছুর নয়?

আর কিছুর? আর কিসের হবে? বলে কুন্দনপ্রকাশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—নীতা কি তোমাকে কিছু বলেছে?

না। কারণ সে চায় নি আমার হাত দিয়ে তার বাবার হাতে হাত কড়া পড়ুক।

কুন্দনপ্রকাশ সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালেন।

আমি সেদিকে একবার আড় চোখে তাকিয়ে বললাম—তবে অন্য সূত্রে আমি সব কিছু জেনেছি।

ভয়ে কুন্দনপ্রকাশের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠল।

আমি বললাম—ভয় নেই কাকাবাবু, নীতার ইচ্ছা আমি পূরণ করব। তার বাবার হাতে হাতকড়া আমি পরাবো না। তবে তার হত্যাকারীকে আমি ধরবই।

কুন্দনপ্রকাশ বললেন—হ্যাঁ ধরো। আমার যা কিছু সব আমি তোমাকে দিয়ে দেবো। এই মার্বেল প্যালেসটাই তোমার নামে লিখে দেবো আমি।

এতবড় প্যালেসটা নিয়ে কি করব আমি? এর ট্যাক্সই তো দিতে পারব না।

তবু দেবো।

তার প্রয়োজন হবে না। কারণ, কোন প্রাপ্তির বিনিময়েই আমি আমার বোনের হত্যাকারীকে ধরতে চাই না। শুধু কর্তব্য এবং বিবেকের খাতিরে তাকে ধরব। তবে সেই হত্যাকারীকে ধরেও কিন্তু ছেড়ে দেবো আমি।

তুমি কি বলছ আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তোমার কথার ঘের পাচ্ছি না আমি। তুমি কি বলতে চাও ঠিক করে বলো।

আমি বলতে চাই তাকে ধরেও আমি পুলিশের হাতে তুলে দেবো না। ফাঁসীর মঞ্চে ওঠাবো না। শুধু তার শাস্তি তাকে নিজেকে দিয়েই দেওয়াব।

আমার সব কিছু কিরকম গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

ও কিছু না। সব ঠিক হয়ে যাবে। কাকাবাবু, নীতার মুখ চেয়ে আপনি আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?

বলো, কি অনুরোধ। নিশ্চয়ই রাখব আমি।

ঠিক তো?

তোমাকে কথা দিলাম।

তাহলে যে পিস্তল দিয়ে আপনি নীতাকে খুন করেছেন সেই পিস্তল দিয়ে আগে নিজেকে শেষ করুন আপনি।

তার মানে? কি বলতে চাও তুমি?

আমি বলতে চাই আপনি এই মুহূর্তে স্যুইসাইড করুন। অবশ্য তার আগে আপনার অপরাধের কথাটা স্বীকার করে একটা কাগজে কিছু লিখে রাখুন আপনি।

এ তুমি কি বলছ?

হ্যাঁ, কাকবাবু। আপনার ভালোর জন্যই বলছি। বিবেকের বিষে তিল তিল করে জ্বলে মরার চেয়ে, ফাঁসীর দড়িতে দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর লম্বা হয়ে ঝোলার চেয়ে এটা অনেক বেশি আরামের হবে। কপালের মাঝখানে যন্ত্রটা একবার ঠেকিয়ে দিয়ে ট্রিগারটা একটু টিপে দেবেন। দেখবেন এত উৎকণ্ঠা এত জ্বালা সব জুড়িয়ে জল হয়ে

যাবে একেবারে। একটু কিছু লিখে রেখে এ কাজ করুন। দেখবেন এতে পুলিশের অযথা হয়রানি বন্ধ হবে। আপনি রেহাই পাবেন। অযথা জেলের ঘানি টানতে হবে না আপনাকে এবং আপনার আদরের মেয়ে নীতারও আত্মার শান্তি হবে।

ঘরের মধ্যে ছুঁচ পড়লেও তখন বুঝি শব্দ শোনা যায় যেন। সে কি দারুণ নিস্তব্ধতা।

দেওয়ালের ঘড়িটা শুধু টিক টিক করে বেজে চলেছে।

কুন্দনপ্রকাশ মড়ার মতো মুখ করে বললেন—এ তুমি কি বলছ অম্বর! আমি আমার আদরের নীতাকে খুন করেছি?

হ্যাঁ।

কোন বাবা কখনো পারে তার সন্তানকে এইভাবে হত্যা করতে?

না।

এই সত্য তুমি কখনো প্রামণ করতে পারবে?

না।

তাহলে?

আমি এবার কঠিন গলায় বললাম—তবুও আমি আপনাকে এই কাজই করতে বলব। আমি জানি, সবাই জানে, কোন বাপ কখনোই তার সন্তানকে সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যা করতে পারে না। কিন্তু মিঃ মাকিন ভুলে যাবেন না আমি আপনার ছেলের বন্ধু হলেও একজন গোয়েন্দা। নীতা যখন আপনার গুণের কথা আমাকে বলতে যাচ্ছিল আপনি তখনই ওর মুখ বন্ধ করবার জন্য আমাকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি গুলি চালানোর ফলে দৈবক্রমে গুলিটা আমাকে না লেগে নীতাকে লাগে। সেটা নেহাৎই একটা দুর্ঘটনা। দিস ইজ অ্যান অ্যাক্সিডেণ্ট।

তুমি ভুল করছ অম্বর, নীতার যেদিন মৃত্যু হয় আমি সেদিন গোয়ায়।

না। আপনি সেদিন হঠাৎই এখানে এসে পড়েছিলেন। আপনি না এলে নীতা মরত না। এটা অবশ্য ওর নিয়তি বলতে পারেন।

অম্বর !

সেদিন আপনি বাড়িতেই ছিলেন এবং লুকিয়ে ছিলেন। ওমের খবর শুনে খুবই বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন আপনি। তবে নীতার মুখ থেকে যখন শুনলেন আমি যাচ্ছি মুক্তিপণ নিয়ে তখন অবশ্য আপনি একটু আশ্বস্ত হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন আমি মুক্তিপণ নিয়ে চলে গেলেই আপনি অনুসরণ করবেন আমাকে। তারপর গোলার মোড়ে লেন দেন হবার পর আমার জন্য একটি বুলেট খরচ করে আপনার পথের কাঁটাকে আপনি সাফ করবেন। কিন্তু আপনি আমাকে কেন আপনার পথের কাঁটা ভাবতেন ? আমি কিন্তু ভুলেও কখনো সন্দেহ করিনি আপনাকে। তাছাড়া রোজ নয়, আমি তো সপ্তাহে মাত্র একটি দিন আসতাম আপনার বাড়িতে।

কি যা তা বলছ তুমি।

আমি বলছি না। নীতার ডায়েরী বলছে। মৃত্যুর দিন দুপুরেও ডায়েরী লিখেছে নীতা।

কি লিখেছে ?

ও যা লিখেছে তা আপনাকে অবশ্যই পড়ে শোনাব। বলে কাঁধের ঝোলা ব্যাগ থেকে নীতার ডায়েরীটা বার করলাম। নীতা লিখেছে, রোজ রাত্রে শোবার সময় আমি ডায়েরী লিখি। আজ দুপুরেই লিখছি। আমার মনে হচ্ছে বাবার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে আমাদের দু' ভাই বোনকেই হয়তো আত্মাহুতি দিতে হবে একদিন। আজ হঠাৎ বাবা ফিরে এসেছেন। দাদার খবর শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, সর্বনাশ হয়েছে।

কেন বাবা ?

ওম যে বেল্‌কে শেষ করবার জন্যে উঠিপড়ি করে লেগেছে বেল্‌ সেটা টের পেয়েছে।

সেকি ! তাহলে উপায় ?

একে আমি নেই, তার ওপরে শিকার তার হাতের মুঠোয়। অতএব কি হবে ভাবতে পারিস ? যাক। ঠিক আছে। আমি

যখন এসে পড়েছি তখন আমি নিজেই যাবো ছদ্মবেশে। যে মুহূর্তে বেলের হাতে অ্যাটাচিটা তুলে দেবো তার পর মুহূর্তেই শেষ করব তাকে। তাতে অবশ্য আমি নিজেও পার পাবো না। তবু ছেলেটা তো রক্ষা পাবে।

কিন্তু বাবা, বেল্ যদি নিজে না এসে অন্য কাউকে পাঠায়?

বাবা একটু চিন্তা করে বললেন—হ্যাঁ, তা অবশ্য হতে পারে। তাছাড়া—

তার চেয়ে তুমি এখানেই আমার কাছে থাকো। আমি বরং অম্বরদাকে পাঠাই, অম্বরদা নিশ্চয়ই অবস্থাটার মোকাবিলা করতে পারবে।

বাবা একটু যেন ভরসা পেয়ে বললেন—অম্বরকে পাঠাবি? পাঠা। তবে ভুলেও যেন আমাদের ভেতরের কথা কিছু ফাঁস করিস না ওদের কাছে। আমি জড়িয়ে পড়ব তাহলে।

বেশ তাই হবে। তবে আমার মনে হয় এখনো সময় আছে। অম্বরদাকে সব কথা খুলে বলা উচিত। অম্বরদা নিশ্চয়ই এই চক্রান্তের জাল থেকে আমাদের উদ্ধার করেতে পারবে।

খবরদার। তুই কি আমাকে বিপদে ফেলতে চাস?

অগত্যা আমি বাবার কথাতেই রাজি হলাম। কিন্তু আমার মন বলছে মুক্তি পেলেও আমার দাদা ফিরতে পারবে না। বাবাও পার পাবেন না বেলের হাত থেকে। আর আমি? বাবা দাদার অবর্তমানে আমকেই কি ছেড়ে দেবে সে? তাই ভাবছি সব কথা অম্বরদাকে আমি খুলে বলবই। অবশ্য বলার সুযোগ যদি না পাই তাই সব কথা এই ডায়েরীতেই লিখে রাখলাম।'

এই পর্যন্ত বলে আমি বললাম—আপনি কি আরো প্রমাণ চান? তাছাড়া আজ এই ঘরের ভেতরে যে সব সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে এই সব টুকরো সেদিনও আমি এ বাড়িতে পেয়েছিলাম। তারপর পকেট থেকে ডট পেনটা বার করে বললাম—এই দেখুন আপনার ডট পেন। তাড়াতাড়িতে এটা আপনি ফেলে গিয়েছিলেন সেদিন। আর আপনার জুতোর ছাপও পুলিশের কাছে আছে।

এর পরও কি বলবেন আপনি নীতার হত্যাকারী নন? আমার দিকে তাক্ করে গুলিটা ছুঁড়েই ধরা পড়বার ভয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে আপনি পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে ছিলেন। তারপর আমার আগেই ধানবাদে গিয়ে গোলার মোড়ে পৌঁছে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন আমার সঙ্গে চরম মোকাবিলা করবার জন্য। কিন্তু যখন দেখলেন বেল মুক্তিপণ নিতে এলো কিন্তু সঙ্গে আপনার ছেলেকে নিয়ে এলো না তখন আপনার মধ্যেই আর আপনি ছিলেন না। অতঙ্কে ভয়ে মূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। একে তো মেয়েকে নিজের হাতে খুন করেছেন। তার ওপর ছেলেরও হদিশ নেই। কাজেই আপনি তখন আর কাউকে হত্যা না করে নিজের ছেলেকে উদ্ধার করবার জন্যই পাগল হয়ে উঠেছিলেন। ইতিমধ্যে বেলকে আমি আক্রমণ করি। ওকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ি। আমার গুলি ওর কাঁধে লাগে। বেল সেই অবস্থাতেই পালাতে গেলে আড়াল থেকে আপনিও গুলি ছোঁড়েন। সে গুলি লাগে ওর পায়ে।

মিঃ মাকিন একটিও কথা না বলে, কোনরকম প্রতিবাদ না করে এক দৃষ্টে আমার মুখের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

আমি বললাম—এ ঘটনার দশদিন পরে বেলকে ইউ. পি. পুলিশ গোরক্ষপুরের কাছে গ্রেপ্তার করে। বেল এখন পুলিশ হাসপাতালে খুব সঙ্গীন অবস্থায় আছে। কলকাতা পুলিশও এই ফেরারী আসামীর এতদিন বাদে একটা সঠিক সংবাদ পেয়ে খুব উল্লসিত। আপনার ছেলের হত্যাকারী তো ধরা পড়েছে। আশা করি আপনিও খুব খুশি হবেন এতে? একি! আপনি এরকম করছেন কেন? কি হ'ল আপনার?

কুন্দনপ্রকাশ মাকিন আমার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ ধীরে ধীরে সোফার ওপর গড়িয়ে পড়লেন।

না। স্যুইসাইড নয়।

ডাক্তার না হলেও যে কেউ বুঝতে পারে এটা সেরিব্রাল থ্রম্বশিস। কি সাংঘাতিক পরিণাম! এখন তো আমার হাসপাতালেই ফোন করা উচিত!

১

সে এক প্রচণ্ড দুর্যোগের রাত।

মোড়িগ্রামে আমার চার কাঠার চৌহদ্দির মধ্যে নিজের ঘরে বসে তন্ময় হয়ে একটা গল্পের বই পড়ছি। অবশ্যই ভূতের গল্প। কেননা রসিক লোকেরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ভূতের গল্প উদ্ভট হলেও বর্ষার রাতে এ ধরণের গল্প মনের মধ্যে বিশেষ একটা ইমেজ সৃষ্টি করে।

পাশেই কেরোসিন স্টোভে ছোট্ট একটা হাঁড়িতে খিচুড়ি বসিয়েছি। রাত এখন নটা পঁয়তাল্লিশ।

বাইরে প্রবল বর্ষণ।

এমন সময় ঘরের কোণ থেকে টেলিফোনটা সশব্দে বেজে উঠল। বই মুড়ে রেখে উঠে গেলাম টেলিফোনের কাছে।

রিসিভার তুলে নিয়ে বললাম—হ্যাল্লো! অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং ··।

আমি ভোলা ট্যাগুন কথা বলছি।

ভোলা! ও মাই গুড্ লাক···হাউ আর য়ু?

আমি খুব বিপদে পড়ে তোমাকে ফোন করছি ভাই।

কি হয়েছে?

আমার ফ্ল্যাটে একটা খুন হয়েছে।

সেকি!

হ্যাঁ। আমার নিচের তলার ফ্ল্যাটে রঘুবীর প্রসাদ নামে এক ভদ্রলোক ভাড়া থাকেন। আমি একটু দরকারি কাজে তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাই। সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ভাড়াটিয়াদের ডেকে সেই দৃশ্য দেখিয়ে পুলিশে ফোন করেই তোমার শরণ নিচ্ছি। প্লিজ হেল্প মি।

পুলিশে ফোন করেছ বেশ করেছ, কিন্তু আমি গিয়ে কি করব ? তুমি কি হত্যাকারীকে ধরতে চাও ?

অফ কোর্স।

বেশ বসে বসে গল্পের বই পড়ছিলাম। দিলে তুমি মুডটাকে নষ্ট করে।

কি বই পড়ছিলে ? হেডলি চেজ ?

না। ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়ের ভূত আরো ভূত।

তা হোক ভাই। আমার জন্যে একটু কিছু করো তুমি। একটু কষ্ট করো। এ আমার ফ্ল্যাটের বদনাম।

কিন্তু···।

কোন কিন্তু নয়। প্লিজ। খুনি আমাদের হাতের মুঠোয়। যদিও সে এখন পলাতক তবুও আমি আশা করি পুলিশের সাহায্য নিয়ে তাকে খুঁজে বার করতে তোমার খুব একটা বেগ পেতে হবে না।

তার মানে খুনি তোমার পরিচিত।

হ্যাঁ। জয় বিশোয়াল নামে একটি ছেলে রঘুবীর প্রসাদের গৃহ-ভৃত্য ছিল। সেই ছেলেটি এই খুনের পর রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে গেছে। অতএব বুঝতেই পারছ খুনি নিজেই নিজেকে চিনিয়ে দিচ্ছে সে খুনি বলে।

স্ট্রেঞ্জ···।

তোমাকে যেভাবেই হোক ছেলেটাকে খুঁজে বার করতে হবে। ব্যাটা শয়তান। আমার ফ্ল্যাটের দুর্নাম করিয়ে দিল। এই ফ্ল্যাটে আর কেউ ভাড়া আসতে চাইবে ? তাছাড়া রঘুবীর প্রসাদের মতো একজন ভালো লোককে···ছিঃ ছিঃ ছিঃ।

বেশ রহস্যময় খুন তাহলে !

তুমি রেডি থেকো। আমি গাড়ি নিয়ে তোমাকে আনবার জন্য এক্ষুণি রওনা হচ্ছি।

আমি আর কিছু বলার আগেই রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ শুনতে পেলাম।

এই প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে ঘর থেকে বেরতে হবে শুনেই গায়ে জ্বর এলো। বই পড়তে পড়তে এমনিতেই ঘুম নেমে আসছিল চোখে। ভাবছিলাম পেট ভরে গরম গরম খিচুড়ি আর ডিম ভাজা খেয়ে বেশ জমপেশ করে তেড়ে একটা ঘুম দেবো, তার জায়গায় একি উৎপাত? তাছাড়া ভোলার ওখানে যাওয়া মানেই কথায় কথায় রাত কাবার। অথচ ভোলার আমন্ত্রণ এড়ানো যাবে না। ও আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। তার ওপর এই মৃত্যুটাও যখন স্বাভাবিক নয় তখন স্বভাবতই একজন গোয়েন্দা হিসাবে আমার একটা কর্তব্য আছে। একজনমানুষের পৃথিবীবাস চিরদিনের জন্য মুছিয়ে দেওয়ার মতো সামাজিক অপরাধ আর কিই বা হতে পারে? তাই আমি অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরী হয়ে ভোলার গাড়ি এসে পৌঁছনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগলাম।

প্রায় ঘণ্টা খানেক অপেক্ষা করার পর ভোলার গাড়ি এলো।

সেই গাড়িতে চেপে মধ্য কলকাতায় ওদের ফ্ল্যাটে যখন এসে পৌঁছলাম তখন অনেক রাত।

চার তলার এই ফ্ল্যাটের সব ঘরেই ভাড়া আছে।

ভোলা নিজেও থাকে এই ফ্ল্যাটেরই দোতলায়।

গ্রাউণ্ড ফ্লোরে থাকতেন রঘুবীর প্রসাদ।

সেই প্রচণ্ড দুর্যোগের রাতে রুম নম্বর ওয়ানে আমি আসার আগেই পুলিশ এসে তাদের কাজ কর্ম শুরু করে দিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে রঘুবীর প্রসাদের ঘরে ঢুকেই দেখলাম একটি সোফায় আধশোয়া হয়ে রঘুবীর প্রসাদ শুয়ে আছেন। তাঁর মাথায় কোন একটি ধারালো অস্ত্রের ঘা দেওয়া। প্রচুর রক্তক্ষরণের মধ্যে সে এক ভয়াবহ দৃশ্যের সৃষ্টি হয়েছে সেখানে।

রাত অধিক হওয়ার জন্য এবং বৃষ্টিপাতের দরুণই সম্ভবত বাইরের লোকের কোন ভিড় নেই সেখানে। শুধু ফ্ল্যাটের বাসিন্দারাই সিঁড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে জটলা করছেন। প্রত্যেকেরই চোখে মুখে উৎকণ্ঠা ও ভয়-ভীতির ছাপ।

আমি তাঁদের উদ্দেশ্য করেই বললাম—আপনারা যে যার ঘরে

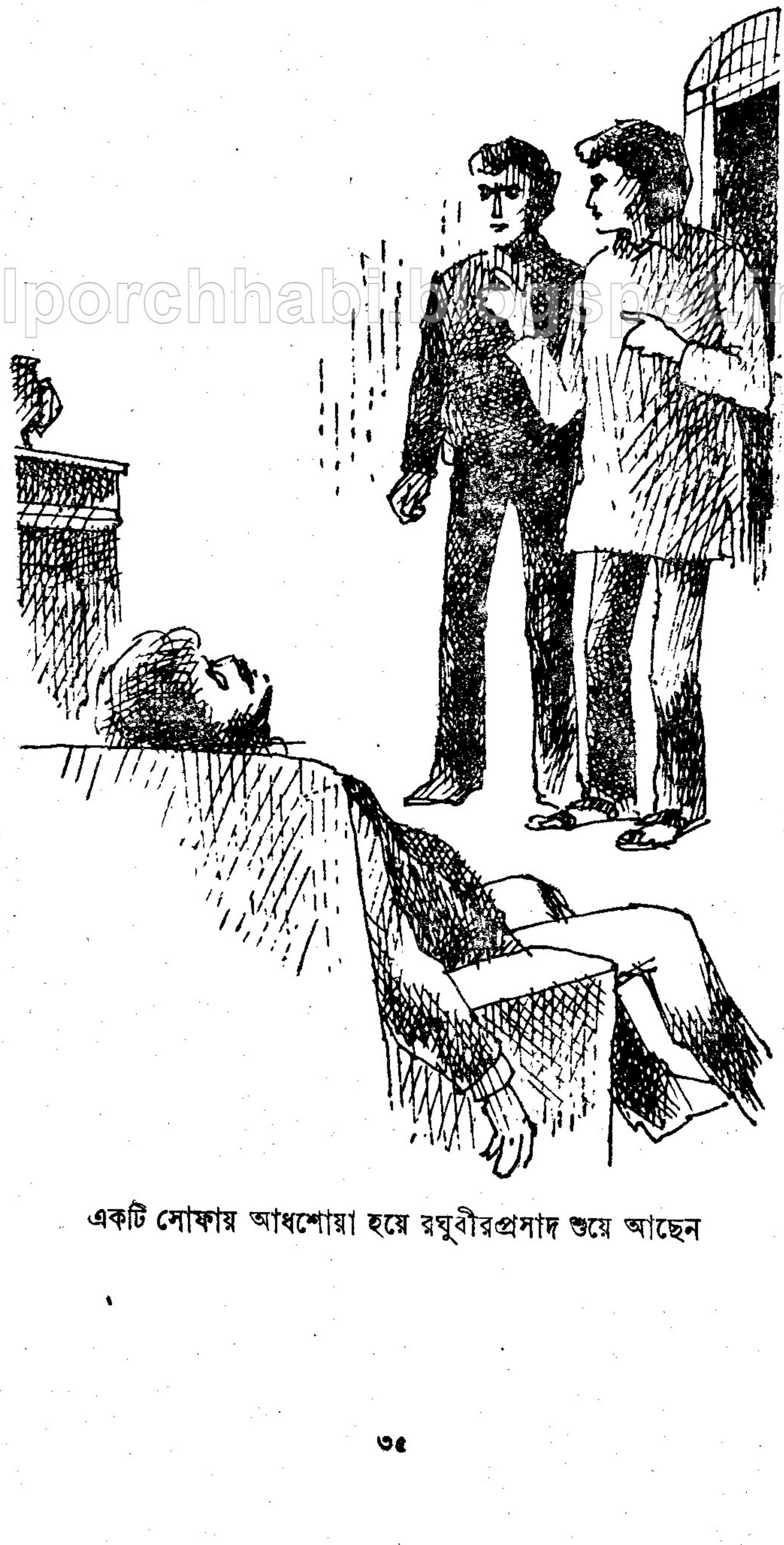

একটি সোফায় আধশোয়া হয়ে রঘুবীরপ্রসাদ শুয়ে আছেন

চলে যান। এখানে দাঁড়িয়ে কোন আলোচনা করবেন না। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরাই আপনাদের ডাকব। বিশেষ করে ছোট ছেলেমেয়ে এবং মহিলাদের এখানে একদম আসতে দেবেন না। কেন না, এই সব দৃশ্য দেখলে তাদের মনে হয়তো অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হবে। বুঝেছেন ?

বলার সঙ্গে সঙ্গেই জটলা থেমে গেল।

সবাই যে যার ঘরে গিয়ে খিল দিলেন।

এদিকে পুলিশ তার কাজ করতে থাকলে আমিও আমার কাজ শুরু করলাম। গোটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজে সন্ধানী দৃষ্টি মেলে যা কিছু দেখবার দেখে ভোলাকে জিজ্ঞেস করলাম—রঘুবীর প্রসাদ কি এখানে একা থাকতেন ?

ভোলা বলল—হ্যাঁ, না, মানে জয় বিশোয়াল নামে ওনার এক চাকর এখানে থাকত।

প্রসাদজী কতদিন আছেন এ ফ্ল্যাটে ?

তা ধরো বছর দশেক।

এই দশ বছর ধরে একা ? ফ্যামিলি নেই ওনার ?

হ্যাঁ। স্ত্রী পুত্র কন্যা সবাই আছে। তারা মাঝে মধ্যে আসে, থাকে। এই তো রঘুবীর প্রসাদের স্ত্রী এবং দুই ছেলে প্রায় মাস খানেক এখানে থাকার পর গত সপ্তাহে দেশে গেল।

কোথায় দেশ ওনার ?

বিকানীরে।

আমি আরো ভালো করে চারদিক দেখে এক জায়গায় একটি ছোট্ট জিনিস কুড়িয়ে পেলাম।

সবার অলক্ষ্যে টুপ করে সেটি পকেটে পুরেই আবার প্রশ্ন করলাম —আচ্ছা, রঘুবীর প্রসাদ বিজ্‌নেসম্যান ছিলেন নিশ্চয়ই ? কিসের ব্যবসা ছিল বলো তো ?

হার্ডওয়ারের। ক্যানিং স্ট্রীটে দোকান আছে।

'হুঁ' বলে আর একবার চারদিক তাকিয়ে দেখলাম। কাদায়

রক্তের দাগে চারদিক প্যাচ প্যাচ করছে।

উত্তরের জানালাটা খোলা থাকায় জলের ঝাপটা ঢুকে ঘরের একদিক ভেসে যাচ্ছে।

আমি জানালাটা বন্ধ করতে করতে বললাম—যে ছেলেটা এখানে কাজ করত তার নাম কি যেন বললে?

জয় বিশোয়াল।

ছেলেটি তাহলে পলাতক?

হ্যাঁ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ কাজ তারই।

কিন্তু একটা কথা কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না খুনি কোন্ জিনিসের সাহায্যে হত্যা করল প্রসাদজীকে? এই ধরণের খুনিরা খুন করে অস্ত্র লুকনোর বুদ্ধি রাখে না।

ভোলা বলল—তা ঠিক, তবে কি জান চ্যাটার্জী, খুনের পর ভয়ে খুনির মনের অবস্থা এমন হয়ে যায় যে প্রমাণ লোপের নানা রকম ফন্দী তার মনের মধ্যে আপনা থেকেই এসে যায়। বিশেষ করে চব্বিশ পঁচিশ বছরের ছেলে। এনতার হিন্দী সিনেমা দেখে। এ সব কাজে পাকা তো সে হবেই।

পুলিশ তখন ডেড বডি সরাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগল। আমাকে জিজ্ঞেস করল—আপনি কি আর কিছু দেখতে চান?

না।

ডেড বডি নিয়ে যেতে পারি?

হ্যাঁ নিয়ে যান। বলে ভোলাকে বললাম—চলো, ওপরে চলো। তোমার ঘরে যাই। পুলিশের কাজ পুলিশ করুক। আমরা গিয়ে একটু চা-টা খাই। খুনের কিনারা করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। পুলিশই ধরবে ব্যাটাকে। পরিস্কার বোঝা যাচ্ছে ঐ ব্যাটারই কাজ এটা।

সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় উঠে ভোলার ফ্ল্যাটে যখন প্রবেশ করলাম তখন মনে হল যেন স্বর্গে প্রবেশ করেছি।

কী চমৎকার সাজানো ঘর।

ভোলা ঘরে ঢুকেই ডাকল—তপতী !

পাশের ঘর থেকে ওর বউ হাসি খুসি মুখে বেরিয়ে এলো। এসেই দুহাত জোড় করে নমস্কার জানাল আমাকে—ভালো আছেন চ্যাটার্জীদা ?

হ্যাঁ, তোমার বাচ্চারা ভালো আছে তো ?

দুটোকেই বোর্ডিং-এ দিয়েছি।

সে কি !

হ্যাঁ, বড় দুরন্ত হয়েছে। একদম যেন মানাতে পারছি না।

ভোলার বউ তপতী বাঙালী মেয়ে। আমারই আর এক বন্ধুর বোন। ছোটবেলা থেকেই ওকে দেখছি। খুব ভালো মেয়ে। আগে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পেত না এত গরীব ছিল। এখন ভাগ্যের জোরে মধ্য কলকাতার এই চমৎকার ফ্ল্যাটের মালিকানী। কয়েক লক্ষ টাকার মালিক। যাক। ঘরে ঢুকে একটি সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললাম—আমাকে এই বাদলার বাজারে আর কিছু নয় স্রেফ একটু চা অথবা কফি খাইয়ে দাও।

তপতী সঙ্গে সঙ্গে কিছু একটা করতে রান্নাঘরে চলে গেল।

আমি আয়েস করে পায়ের উপর পা তুলে বললাম—আচ্ছা ভোলা, এইবার দু' একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করি। দাঁড়াও তার আগে একবার বাথরুমের কাজটা সেরে আসি।

এক মিনিট। আলোটা জ্বেলে দিই।

ভোলা সুইচ টিপলে আমি বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে জল দিতে গিয়েই কেমন যেন শিউরে উঠলাম। হঠাৎ রঘুবীর প্রসাদের সেই রক্তে ভাসা মুখখানা আমার চোখের সামনে ফুটে উঠল। আমি আর এক মুহূর্ত সেখানে না থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার হাত পা যেন কাঁপছে।

ভোলা বলল—কি হল চ্যাটার্জী ?

কিছু না। হঠাৎ মাথাটা কি রকম ঘুরে গেল। বলে আবার সোফায় বসে বললাম—আসলে ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে রাত্রি জাগরণ তো। তা যাক। আসল কথায় আসি।

বলো।

জয় বিশোয়াল প্রসাদজীর কাছে কত দিন ছিল ?

অনেক দিন।

তবু ?

আগের কথা বলতে পারব না। তবে প্রসাদজী ওকে সঙ্গে নিয়েই আমার ফ্ল্যাটে এসেছিলেন।

অ। তাহলে একেবারে নতুন নয়। যেমন পুরাতন ভৃত্য। বলে কিছুক্ষণ পায়ের ওপর পা রেখে পা নাড়তে লাগলাম। তারপর বললাম, পুরাতন ভৃত্যরা কিন্তু শুনেছি খুবই বিশ্বাসী হয়। সচরাচর তারা এরকম করে না।

এ ক্ষেত্রে তো করেছে।

এটা ব্যতিক্রম। অবশ্য কার মনে যে কখন কি মতলব আসে তা কেউ বলতে পারে না।

ব্যাপার কি জানো, যখন ছোট ছিল তখনকার কথা আলাদা। কিছু বুঝত না। এখন বুঝতে শিখেছে। টাকা পয়সার মূল্য, জিনিস-পত্তরের দাম সম্বন্ধে অবহিত হতে পেরেছে। বিশেষ করে ওকে সন্ধ্যেবেলা আমি ঘর গুছাতে দেখেছি।

আচ্ছা ?

তবে বলছি কি ? তার পরই খুন। এবং খুনের সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেটি উধাও।

শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে সিন্দুকটাও খালি।

সেকি !

তাহলেই বোঝো। আর কি সন্দেহের অবকাশ থাকে ? খুন-টুন করে পাখি হয়তো এখন দিল্লি কি বম্বের দিকে উড়ছে।

কিন্তু ও ঘরে কোন সিন্দুক দেখলাম না তো আমি।

দেখনি ?

না।

—ওঃ হো। ওটা তো কভার দিয়ে ঢাকা ছিল। দেখবে ?

—নিশ্চয়ই।

—চলো তবে।

আমরা নেমে এলাম। সব কাজ শেষ করে পুলিশ তখন যাবার উদ্‌যোগ করছে।

আমি বললাম—এক মিনিট। বলে ভোলার সঙ্গে ঘরে ঢুকলাম।

ভোলা ঘরের এক কোণে গিয়ে ঢাকা সরিয়ে সিন্দুকের তালা খুলতেই দেখলাম সব ফর্সা। শূন্য সিন্দুক খাঁ খাঁ করছে।

ষ্ট্রেঞ্জ।

এর ভেতরে টাকা পয়সা সোনা-দানা সব কিছুই ছিল। কিছু না হলেও দশ বিশ হাজার টাকা তো সব সময়ই থাকত প্রসাদজীর কাছে। তাছাড়া সামনেই প্রসাদজীর মেয়ের বিয়ে। প্রচুর গয়না-গাঁটিও সেই উপলক্ষ্যে কিনেছিলেন তিনি। কিছু স্ত্রী এসে নিয়ে গেছে। কিছু ছিল। প্রসাদজীর স্ত্রী একটি বহুমূল্য নেকলেস পালিশের জন্য এবং হীরে সেটিংয়ের জন্য দেখ গিয়েছিলেন। সেটিও নেই। জয় বিশোয়াল ছাড়া এই সব গোপন সামগ্রীর কথা কেউ জানত না। আমাদের ঘরে জয় মাঝে মাঝে আসত এবং তপতীর কাছে বলত। তাই আমরা এসব জানি। অতএব বুঝতে পারছ তো খুনি কে?

—পারছি। কিন্তু কিভাবে খুন হল সেটাই আমাকে দেখতে হবে।

পুলিশের লোকেরা বাইরে তখন অধৈর্য হয়ে পড়ছিল। তাই বললাম—আপনারা এবার যেতে পারেন। আমি বাকিটা তদন্ত করছি।

ওরা চলে গেলে আমি ভোলাকে বললাম—আচ্ছা ট্যাণ্ডন, এবার বলতো ভাই, তোমার ফ্ল্যাটে মোট কতজন ভাড়াটে আছে?

—তা ধরে টু-রুম ফ্ল্যাট তো, নিচে প্রসাদজী এবং সুকুলজী।

—সুকুলজী!

—হ্যাঁ, সামনের দিকে থাকে।

—কি করেন ভদ্রলোক?

—ট্যাক্সি ড্রাইভার। নিজেরই ট্যাক্সি অবশ্য। ইউ. পি.-র লোক। ওর পরিবারবর্গকে নিয়েই থাকে।

—হুম। তোমরা থাকো দোতলায়। তোমার সামনের ঘরে তো ডঃ ভট্টাচার্য থাকেন। খুবই ভদ্র। আলাপ হয়েছিল একবার।

—শুধু ডঃ ভট্টাচার্য কেন? সত্যি কথা বলতে কি ভাই আমার ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা প্রত্যেকেই খুব ভদ্র। তারা কেউই সন্দেহজনক নয়। সুকুলজীই যা একটু নেশা-ভাঙ করে। তাছাড়া লোকটার আর কোন দোষ নেই। এইসব খুনটুন—। ওরে বাবা, এ ওর পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

galpochhabi.blogspot.in

আমি হেসে বললাম—ক্রিমিন্যাল কেসে আমার অভিজ্ঞতায় অসম্ভব বলে কিছু নেই।

এমন সময় সিঁড়ির কাছ থেকে তপতীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মিঃ চ্যাটার্জী, আপনার কফি রেডি।

তপতী আমাকে কখনো মিঃ চ্যাটার্জী কখনো চ্যাটার্জীদা বলে। তপতীর ডাক শুনে ট্যাগুনকে বললাম—চলো। আবার ওপরে যাওয়া যাক।

আমরা দুজনে ঘরের দরজায় শিকল দিয়ে ওপরে উঠলাম।

ট্যাগুন বলল—তুমি ইচ্ছে করলে আজ রাতে অথবা কাল সকালে এসে আমার ভাড়াটিয়াদের জবানবন্দী নিতে পারো।

আমি হেসে বললাম—তার কোন প্রয়োজন দেখছি না। দুই আর দুইয়ে চারের মতোই হিসাব এখানে পাকা। এখন যে ভাবেই হোক জয় বিশোয়ালকে গ্রেপ্তার করতে হবে।

আবার ঘরে এসে সোফায় গা এলিয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিলাম।

রাত শেষ হয়ে আসছে।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনটে বাজতে দু'মিনিট বাকি।

কফি খেতে খেতেই তপতীর দিকে চেয়ে হেসে বললাম—মেনি থ্যাঙ্কস্। এই রকম একটি দারুণ মুহূর্তে কফি খাওয়ানোর জন্য অশেষ

ধন্যবাদ।

তপতীও হেসে বলল—ঠিক এই রকম অনুরোধ আমিও আপনাকে দিতে পারি, যদি অনুগ্রহ করে আপনি আজ রাতে আর বাড়ি ফিরে না যান।

আমি হেসে বললাম—আসলে ব্যাপার কি জান তপতী, আমি একটু বেলা অব্দি ঘুমোই। আর একা থেকে থেকে এমন একটা অভ্যাস হয়ে গেছে আমার যে অন্য কোথাও রাত্রিবাস করাটা ঠিক পোষায় না। আমি শুধু তোমাদের আর দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করেই পালাব এখান থেকে। মনে হচ্ছে দুর্যোগও একটু একটু করে কেটে আসছে।

ট্যাণ্ডন বলল—থাকতে পারতে আজকের রাতটা।

তুমি তো আমাকে জানো ভাই? তবে কেন অনুরোধ করছ? তা যাক। তুমি তাহলে বলছ তোমার ভাড়াটিয়ারা মোটেই সন্দেহ-জনক নয়?

আমি এর আগেও বলেছি। এখনো বলছি। একেবারেই না।

তাহলে ঘুরে ফিরে সন্দেহটা জয় বিশোয়ালের ওপরই পড়ছে। ওর দেশ নিশ্চয়ই ওড়িষা?

তুমি কি করে জানলে?

সারনেমই বলে দিচ্ছে।

হ্যাঁ। ওড়িষায়।

ঠিকানা জান?

না ভাই। অন্যের বাড়ির চাকরের ঠিকানা কে কবে জেনে রেখেছে বলো? তবে এটুকু জানি বালাশোর ডিস্ট্রিক্ট-এ ওর বাড়ি।

এরপর কিছুক্ষণ চুপচাপ।

নীরবতা ভেঙে এক সময় আমিই বললাম—প্রসাদজীর বাড়িতে খবর পাঠানোর কি হবে?

আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে একটা টেলিগ্রাম করব। তাছাড়া পুলিশকে তো সব বলেছি। পুলিশ নিশ্চয়ই খবর দেবে। সত্যি, কি দুর্ভাগ্য বলো তো? এই গত সপ্তাহে ওর বউ ছেলে দেশে গেল।

সামনেই মেয়ের বিয়ে। আর এদিকে কি সর্বনাশ। এই জন্যই কোন স্থায়ী ঝি-চাকর বাড়িতে রাখতে নেই।

ঠিক আছে। কালপ্রিটটাকে খুঁজে বার করছি। কিন্তু আশ্চর্য! এত বড় একটা মার্ডার হয়ে গেল অথচ তোমরা কেউ একটা আর্তনাদও শুনতে পেলে না?

কি করে শুনব? যা দুর্যোগ। সবারই ঘরের জানালা দরজা তো বন্ধ।

তবু রক্ষে যে তুমি টের পেয়েছ। নাহলে সারা রাতেও কেউ জানতে পারত না।

আমিও টের পেতাম না। দিব্যি ঘরে বসে রেডিওতে বিবিধ ভারতীর অনুষ্ঠান শুনছি। তপতী উল বুনছিল। হঠাৎ ও-ই বলল—আচ্ছা নিচের ঘর থেকে যেন প্রসাদজীর চিৎকার শুনতে পেলাম।

সে কি! বলে রেডিও বন্ধ করে আর কিছু শোনা যায় কিনা তা শোনবার জন্য কান খাড়া করে রইলাম। তবুও তপতীর জেদাজিদিতেই নিচে নেমে গিয়ে দেখি সর্বনাশা কাণ্ড। সকলকেই তখন ডেকে দেখাই। থানায় ফোন করি। তোমাকে জানাই।

ব্যস ঠিক আছে। এখন চলো তো আর একবার ঘরটা দেখি।

এই নিয়ে তিনবার হবে।

একটা কথা আছে জানো তো, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই—।

সত্যি, তোমরা গোয়েন্দারা পারোও বটে। ধৈর্য বটে তোমাদের।

তুমি বিরক্ত হোচ্ছ না তো?

আরে না না। কি যে বলো। চলো।

আমি তপতীকে বললাম—আজ যাচ্ছি। কাল দুপুর অথবা সন্ধ্যায় আবার আসব। আমাকে আর একবার কফি খাওয়াতে রাগ করবে না নিশ্চয়ই?

তা করব না। তবে আপনার এই চলে যাওয়ার জন্য ভীষণ রাগ করব।

আমি ট্যাণ্ডনকে নিয়ে আবার প্রসাদজীর ঘরে ঢুকলাম।

এটা শোবার ঘর। ও পাশে কিচেন। তারপর বাথরুম।

আর সেদিকে যেতে গিয়েই দেখি হঠাৎ এক জায়গায় চাপ চাপ রক্ত।

এ ঘরে একটি ভয়ানক হত্যাকাণ্ড হলেও এখানে এত রক্ত কি করে এলো?

তাই অবাক বিস্ময়ে ডাকলাম—ভোলা! কুইক।

ট্যাণ্ডন ছুটে এলো আমার কাছে—কি হয়েছে?

লুক দ্যাট।

এ তো রক্ত!

রক্ত! কিন্তু এত রক্ত এখানে কি করে এলো?

তাই তো।

রক্তটা কিচেনের মধ্যেই চাপ চাপ বেশি। তারপর বিন্দু বিন্দু ধারায় বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেছে।

বাথরুমের ভেতরেও রক্ত।

অথচ আর কোথাও নেই।

ট্যাণ্ডন বলল—আমার মনে হয় প্রথমে প্রসাদজীকে খুন করে বাথরুমে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। তারপরে আবার যে কোন কারণেই হোক প্রসাদজীকে টেনে এনে সোফার ওপর বসিয়ে দেওয়া হয়।

ঠিক। কিন্তু সেক্ষেত্রে সোফা পর্যন্ত একটু রক্তের ধারা তো মেঝেতে আশা করতে পারি।

পারো। কিন্তু খোলা জানলা দিয়ে জলের ঝাপটা এবং অত পুলিশের বুটের কাদায় সব তো মাখামাখি হয়ে গেছে ভাই।

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বললাম—ঠিক।

ভোলা বলল—আর কিছু দেখবে?

নাঃ। ভারি ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার। ঠিক আছে চলো। এখন তো বাড়ি ফেরা যাক। কাল সকালে ভেবেচিন্তে দেখব কতদূর কি সিদ্ধান্তে আসা যায়।

ট্যাণ্ডনের গাড়ি আবার আমাকে যখন আমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেল তখন ভোর হতে আর দেরি নেই।

যদিও রাত শেষ করে ভোরের আগে বাড়ি পৌঁছলাম তবুও শোওয়া মাত্রই যত রাজ্যের ঘুম এসে চোখে ভর করল। কাল সারারাত ধরে যা সব দেখেছি তা দেখলে কোন সুস্থ এবং সাধারণ মানুষের চোখে ঘুম আসবে না। কিন্তু আমি ঐরকম ভয়াবহ দৃশ্য দেখে এতই অভ্যস্ত যে ওসবে আর মনের মধ্যে কোন প্রভাব বিস্তার করে না।

পরদিন প্রায় বেলা দশটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে মুখ হাত ধুয়ে চা খেতে খেতে প্রসাদজীর ঘরে কুড়িয়ে পাওয়া জিনিসটা পকেট থেকে বার করে আর একবার নেড়ে চেড়ে দেখলাম।

এটা আমার খুবই পরিচিত। তাই বিস্ময়ের ঘোরে বার বারই নানা রকম কথা চিন্তা করতে লাগলাম। কিছুতেই ভেবে পেলাম না এটা কি করে ওখানে যেতে পারে।

যাই হোক। আমি সেটা আবার যথাস্থানে রেখে সকালের কাগজটার দিকে মন দিলাম।

না। প্রসাদজীর খুনের খবর কোথাও এতটুকুও ছাপা হয়নি। হয়তো কাল হবে।

অথচ এটা একটা দারুণ খবর।

আমি কাগজ রেখে টেলিফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলাম—হ্যাল্লো! লালবাজার।

ওদিক থেকে উত্তর এলো....ইয়েস।

একটু হোমিসাইড ডিপার্টমেণ্টকে দিন না?

অপারেটর সঙ্গে সঙ্গে কানেকশন দিয়ে দিল।

হ্যাল্লো! অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং।...কে! মিঃ কাঞ্জিলাল? কাল রাত্রে প্রসাদজীর ঐ খুনের ব্যাপারটা নিয়ে কথা বলছি। তালতলা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে যেটার তদন্ত করা হয়েছিল।....কি বললেন? চাকরটাকে অ্যারেস্ট করার সব রকম ব্যবস্থা করে ফেলেছেন? দেশের

ঠিকানা পেয়েছেন ওর ?···আচ্ছা।···পায়ের ছাপ-টাপ কিছু পাননি ?··· তাহলে ?···হ্যাঁ, জানলাটা তো খোলা ছিল। জলের ঝাপটায় সব নষ্ট হয়ে গেছে। যাক প্রসাদজীর বাড়িতে একটা খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করুন। এই বলে রিসিভার নামিয়ে রেখে গুম হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।

কাল রাতের খুনের ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনা চিন্তা করতে লাগলাম। অনেক রকম সন্দেহ মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। প্রথমেই যেটা মনে হল, সেটা হল খুনটা কখনই কাঁচা হাতের নয়। বরং বেশ পাকা হাতের। দ্বিতীয়তঃ খুনটা যদি কিচেনের মধ্যেই হয়ে থাকে তাহলে কিচেন থেকে লাশটাকে বাথরুম পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য বাথরুমেও চাপ চাপ রক্ত পাওয়া গেছে। অথচ সোফার কাছ পর্যন্ত লাশটাকে টেনে নিয়ে যাবার পথে কোথাও এতটুকুও রক্ত নেই। ধরা যেতে পারে বাথরুমে অনেকক্ষণ ফেলে রাখার জন্য রক্তক্ষরণ শেষ হয়ে গেছে। তা যদি হোত তাহলে তারও অনেক পরে সোফাটা রক্তে ভেসে গেল কি করে? তৃতীয়তঃ খুনি লাশটাকে বাথরুমে ঢুকিয়ে আবার কিসের স্বার্থে সেটাকে টেনে এনে সোফায় বসাবে? চতুর্থ সন্দেহ, যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রসাদজীকে হত্যা করা হল সেটা ঘরের ভেতরে নেই কেন? বিশেষ করে হত্যাকারী যেখানে প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে পলাতক? হত্যাকারী কেন মারাত্মক অস্ত্রটিকেও বোঝা স্বরূপ নিয়ে ঘুরবে? পঞ্চম সন্দেহ যেটা আমার মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে তা যদি সত্যি হয় তাহলে তো আরো ভয়ঙ্কর ব্যাপার। কেননা ঐ বাড়িতে খুনের তদন্ত করতে গিয়ে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তা ভাবলেও গা মাথা ঝিম ঝিম করে।

আর ভাবতে পারলাম না।

উঠে গিয়ে ডায়াল করলাম—হ্যাল্লো!

ওদিক থেকে তপতীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম···কে? মিঃ চ্যাটার্জী?

হ্যাঁ। ভোলাকে একবার ডেকে দাও তো।

…কি হল হঠাৎ ?

বিশেষ জরুরী দরকার।

…একটু ধরুন, ও বোধ হয় বাথরুমে গেছে।

ধরে রইলাম।

একটু পরেই ট্যাণ্ডনের গলার স্বর ভেসে এলো…বলো। কি ব্যাপার !

তোমার গাড়িটা এক্ষুনি একবার পাঠিয়ে দাও। যত তাড়াতাড়ি পারো।

…হঠাৎ ?

বিশেষ দরকার।

….এক্ষুনি পাঠাচ্ছি। কোন সূত্র পেলে নাকি ?

সব বলব। এসব কথা ফোনে হয় না।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে যাবার জন্য তৈরী হয়ে নিলাম। উত্তেজনায় রগের শিরাগুলো জ্বলছে আমার।

তৈরী হয়ে আর একবার ফোন করলাম লালবাজারে।

ওদিক থেকে মিঃ কাঞ্জিলালের গলা শোনা গেল….কে! মিঃ চ্যাঠার্জী ? বলুন।

আপনি এখুনি কিছু পুলিশ সঙ্গে নিয়ে মিঃ ট্যাণ্ডনের ফ্ল্যাটে চলে আসুন।

….কি ব্যাপার ?

একটা চমৎকার সিদ্ধান্তে আমি এসেছি।

…ডোণ্ট মাইণ্ড মিঃ চ্যাটার্জী। এই আপনার প্রথম পরাজয়।

তার মানে ?

…আপনি যে সিদ্ধান্তেই এসে থাকুন না কেন, হত্যাকারী এখন পুলিশ মর্গে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম—কি রকম !

….রঘুবীর প্রসাদজীর হত্যাকারী জয় বিশোয়াল কাল রাতে খুন করে পালাবার সময় আপনাদেরই হাওড়ার বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজে গাড়ি চাপা

পড়ে মারা গেছে।

বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজে! ওখানে তো এখন গাড়ি চলাচল বন্ধ।

…আরে মশাই বাক্‌ল্যাণ্ড ব্রীজে মানে ওর পাশেই নতুন যেটা হল।

অর্থাৎ বঙ্কিম সেতুতে।

….হ্যাঁ।

তারপর ?

….তারপর আর কি ? গাড়ির চাকায় মাথাটা গুঁড়িয়ে গেছে একেবারে। সে এমনই বীভৎস দৃশ্য যে দেখলে শিউরে উঠবেন, চেনা যাচ্ছে না একদম।

তাহলে আপনারা চিনলেন কি করে ?

…আপনার বন্ধু ভোলাবাবুও সনাক্ত করেছেন তাকে।

বলেন কি ?

…হ্যাঁ।

এমন সময় বাইরে মোটরের হর্ন শোনা গেল।

আমি রিসিভার নামিয়ে রেখে চেঁচিয়ে বললাম—যাচ্ছি।

হাতের সামনেই স্যুটকেশটা ছিল। সেটা চটপট গুছিয়ে নিয়ে আমার অ্যাটাচিটাও যথাস্থানে নেওয়া হয়েছে কিনা দেখে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগালাম।

ট্যাণ্ডনের গাড়ি নিয়ে ওর ড্রাইভার এসেছে। তাকে হেসে বললাম —কি ব্যাপার! বাবু খুব ব্যস্ত নাকি ?

হ্যাঁ, বাবু তো পুলিশ ঘর করছে। কাল যা হয়ে গেল।

কাল আপনি কোথায় ছিলেন ?

আমি তো বাড়িতেই ছিলাম। কিছুই জানি না আমি। বৃষ্টি বাদলার দিন দেখে বাবু বললেন, আজ আর কোথাও বেরবো না। তুমি আর মিছিমিছি কষ্ট করো কেন ? যাও, তোমার ছুটি। তাই আমি বাড়ি চলে গিয়েছিলাম। আজ সকালে এসে শুনি রাতারাতি এত সব কাণ্ড হয়ে গেছে। অথচ বাবু বিশ্বাস করুন, জয় বিশোয়াল

যে এ কাজ করবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ছেলেটা খুব বিশ্বাসী ছিল। কিন্তু পাপের পরিণাম কিরকম হাতে হাতে পেয়ে গেল দেখুন।

সবই কপাল। এই বলে গাড়িতে উঠতে গিয়েই বললাম—এই যাঃ। খুব ভুল হয়ে গেছে। আপনি এক কাজ করুন জগদীশদা, এই নিন চাবি। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে স্যুটকেশটা টেবিলের ওপর রেখে এসেছি। আপনি ঘরে ঢুকেই দেখবেন ডানদিকে টেবিলের ওপর চামড়ার একটা স্যুটকেস রাখা আছে। সেটা নিয়ে আসুন। কিছু মনে করলেন না তো?

না না। কি মনে করব? আপনি কত বড় মানুষ। আমি সামান্য একজন।

জগদীশদা চলে গেলে আমি পায়চারি করতে লাগলাম। তারপর গাড়ির পিছনে এসে ডালা তুলে দেখলাম স্যুটকেশটা ভেতরে রাখা যাবে কিনা। হ্যাঁ। ভেতরটা ফাঁকা। জগদীশদা স্যুটকেশ নিয়ে এলে স্যুটকেশটাকে পিছনে রেখে ডালা বন্ধ করে গাড়িতে উঠলাম।

এরপর প্রায় আধ ঘণ্টার মধ্যেই ট্যাণ্ডনের ফ্ল্যাটে গিয়ে যখন পৌঁছলাম তখন দেখলাম নীচের ঘরে চাবি দেওয়া। এবং ওপরের ঘরে তপতী, ট্যাণ্ডন ও মিঃ কাঞ্জিলাল রীতি মতো খোশ গল্পে মেতে উঠেছেন। তার ওপর আমি গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় আনন্দের আর অবধি রইল না।

ট্যাণ্ডন বলল—তুমি নিশ্চয়ই খবর পেয়েছো ভাই কালপ্রিট ধরা পড়েছে। তবে দুঃখের বিষয় এই যে ফাঁসির দড়িটা ব্যাটার গলায় লটকাতে পারা গেল না।

কাঞ্জিলাল বললেন—তা না যাক, তার চেয়েও অনেক বড় শাস্তি সে পেয়েছে। এবং সব চেয়ে বড় কথা ব্যাটা মরে বাঁচিয়েছে আমাদের। কি বলেন মিঃ চ্যাটার্জী?

আমি হেসে বললাম—আমি আর কি বলব বলুন? এরকম নাটক তো এর আগে আর কখনো দেখিনি। তারপর তপতীর দিকে চেয়ে বললাম—কালকের কথাটা মনে আছে নিশ্চয়ই?

কি কথা ?

এক পেয়ালা কফি। এবং গরম গরম।

ওঃ হো। শুধু কফি কেন ? আজ সারাদিন এখানে থাকতে হবে আপনাদের। আপনার এবং মিঃ কাঞ্জিলালের মেমন্তন্ন এখানে। গরম ভাত আর মুর্গির মাংস না খেয়ে যেতেই পারবেন না এখানে থেকে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম—ওরে বাবা। ওসব আজ নয়। আমাকে এক্ষনি বর্ধমানের ট্রেন ধরতে হবে। আমি একেবারে তৈরী হয়ে বেরিয়েছি।

বর্ধমান! হঠাৎ ?

দেশ থেকে একটা চিঠি এসেছে। খুবই জরুরী। কাজেই যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। দু'তিন দিন থাকতেও হবে। পরে এসে একদিন খেয়ে যাব। মিঃ কাঞ্জিলাল বরং····।

মিঃ কাঞ্জিলাল বললেন—তা কি করে হয় ? আপনার বন্ধুর বাড়ি। আপনি থাকবেন না, অথচ···। আমিও তাহলে পরেই খাবো।

তপতী কফি নিয়ে এলে কফি খেয়েই উঠে পড়লাম।

ট্যাণ্ডন বলল—আমার গাড়ি তাহলে পৌঁছে দিক তোমাকে।

আমি কাঞ্জিলালকে বললাম—আপনার জিপ আছে তো ?

হ্যাঁ। মোড়ের মাথায় রেখে এসেছি।

আমি আপনার জিপেই লালবাজারে যাবো। একবার ছোকরার লাশটা দেখে স্টিফেন হাউসে একটা কাজ সেরে ওখান থেকেই একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাবো।

ট্যাণ্ডন বলল—আমি কত আশা করেছিলাম তোমাদের দুজনকে আজ দম ভোর খাওয়াবো।

তাতে কি হয়েছে ? আমি তো তিন চারদিন বাদেই আসছি। এই বলে বিদায় নিলাম।

নীচে নেমে এসে ট্যাণ্ডনের অস্টিনের পিছন থেকে আমার স্যুটকেশটাকে বার করে কাঞ্জিলালের জিপে উঠলাম।

জয় বিশোয়ালের মৃতদেহটা দেখার পর আমার স্যুটকেশটা কাঞ্জিলালকে দেখিয়ে বললাম—দেখুন তো এটা কিসের দাগ ?

কাঞ্জিলাল সিউরে উঠলেন—একি ! এ তো রক্তের দাগ দেখছি।

ঠিকই দেখছেন। এই স্যুটকেশের গায়ে লেগে থাকা রক্ত আর জয় বিশোয়ালের শরীরে রক্ত এক কিনা একটু পরীক্ষা করিয়ে দেখা যায় কি ?

কেন যাবে না ?

খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু।

আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ চ্যাটার্জী। কি ব্যাপার বলুন তো ?

আমি এক চোখ টিপে এমন এক অদ্ভুতভাবে হাসলাম মিঃ কাঞ্জিলালের দিকে চেয়ে যে তার অর্থ তিনি একজন দু'দে পুলিশ অফিসার এবং অত্যন্ত অভিজ্ঞ লোক, নিশ্চয়ই বুঝতে পারলেন।

কলিংবেলে মৃদু চাপ দিতেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠের স্বর শোনা গেল—কে !

তপতীর কণ্ঠস্বর।

আমি সাড়া না দিয়েই আবার বেল টিপলাম।

একটু দেরি করেই দরজাটা খুলল তপতী। তারপর আমাকে দেখেই চমকে উঠল।

ট্যাণ্ডনও অবাক বিস্ময়ে আমাকে দেখছে।

ভেতরে আসতে পারি ?

বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ট্যাণ্ডন এবং তপতী দুজনেই মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলল—নিশ্চয়ই।

ট্যাণ্ডন বলল—তুমি বর্ধমানে গেলে না ?

না গেলাম না। তবে হঠাৎ ফিরে এসে তোমাদের খুব বিব্রত করলাম না তো ?

আরে না না। তবে তুমি খুব ভালো সময়ে এসে পড়েছ। আর

একটু পরে এলে আমাদের পেতে না। একটু বেরোবার তোড়জোড় করছিলাম। কিন্তু তোমাকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে। কি হয়েছে তোমার ?

কিছুই না। বরং আমারও তোমাদের দেখে মনে হচ্ছে আমি যেন খুব অসময়ে তোমাদের এখানে এসে পড়েছি।

যাঃ কি যে বলো।

তুজনে ঝগড়া ঝাঁটি করছিলে না তো ?

না না। লালবাজারে গিয়েছিলে ?

হ্যাঁ। সত্যি, কি বীভৎস দৃশ্য। চোখে দেখা যায় না। যাক। একটা সিগারেট দাও তো।

ট্যাণ্ডন ওর সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা দামী সিগারেট বার করে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলল—আশ্চর্য ? আমি যতদূর জানি তুমি সিগারেট খাও না।

আমিও বিস্মিত হয়ে বললাম—সত্যিই তো। আমি তো স্মোক করি না। হঠাৎ এরকম খেয়াল হল কেন বলতো ? আরে একি ? ভোলা, তোমার হাতের আংটির ওপর যে দামী পাথরটা বসানো ছিল সেটা কোথায় ?

হঠাৎ লক্ষ্য পড়ায় ট্যাণ্ডনও চমকে উঠল। ভয়ে ওর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অস্ফুট স্বরে সে বলল—তাই তো! গেল কোথায় পাথরটা ?

যেখানেই যাক। তুমি অত বিমর্ষ হয়ে পড়লে কেন ভাই!

ট্যাণ্ডন বলল—চ্যাটার্জী। আমার হাত পা কাঁপছে। তুমি বিশ্বাস করো, দামী পাথর বলে নয়। এই পাথরটা আমাদের তিন পুরুষের। আমাদের মধ্যে একটা সংস্কার আছে যে এই পাথর হারানো মানেই একটা দারুণ বিপদের মেঘ ঘনিয়ে আসা।

ওসব বাজে কথা। বিপদের মেঘ তো কেটেই গেল বরং। আর তাই যদি ভাবো তাহলে দেখতো এই পাথরটা তোমার আংটিতে লাগানো যায় কিনা।

পাথরটা দেখেই চমকে উঠল ট্যাণ্ডন—আরে! এতো সেই পাথর। এ তুমি কোথায় পেলে?

কাল রাত্রে প্রসাদজীর ঘর থেকে কুড়িয়ে পেয়েছি।

ট্যাণ্ডন হাসির অভিনয় করে বলল—তা হবে। কাল তো দুজনে ঢুকে ছিলাম ঐ ঘরে। ঐ সময়েই হয়তো পড়ে থাকবে।

যখনই পড়ে থাকুক। তোমার জিনিস তুমি ফিরে পেলে তো? আশা করি বিপদের মেঘ এবার কেটে গেল।

ট্যাণ্ডন বলল—না না। বিপদ আবার কি? তা যাক। কি খাবে বলো? গরম ভাত, মুর্গীর মাংস, আর কি? দই সন্দেশ নিশ্চয়ই চলবে।

নাঃ। আজ ভাবছি কিছুই খাবো না। ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখার পর আর কিছুই খেতে মন চাইছে না। দু'দুটো মানুষকে এক রাতে যে ভাবে হত্যা করা হল তাতে—

চ্যাটার্জী! প্রায় চিৎকার করে উঠল ট্যাণ্ডন। —কি বলছ তুমি! দু'দুটো খুন হবে কেন? জয় বিশোয়ালের কেসটা স্রেফ একটা অ্যাক্সিডেণ্ট।

না। জয় বিশোয়ালকেও খুন করা হয়েছে। এবং পরে তাকে নির্জন সেতুর ওপর ফেলে একটা মোটরের চাকায় বার বার পিষ্ট করা হয়েছে। যাতে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় ওটা অ্যাক্সিডেণ্ট। এখন যে ভাবেই হোক সেই অজ্ঞাত আততায়ীকে খুঁজে বার করতেই হবে।

অসম্ভব। এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না। তবে কিছুদিন আগে সুকুলজীর সঙ্গে জয় বিশোয়ালের প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল। কিন্তু তাই বলে—।

সুকুলজীকে তুমি কেন সন্দেহ করছ?

এ ছাড়া মোটর এখানে কারই বা আছে?

একটু মনে করে দেখবার চেষ্টা করো তো? মোটর কার কার আছে বা থাকতে পারে? আর একটা কথা তুমি এবার পরিস্কার করে বলো দেখি কাল রাতে ঠিক কি কি হয়েছিল। তুমি যখন আমাকে

ফোন করেছিলে তখন বলেছিলে তুমি কি একটা দরকারি কাজে রঘুবীর প্রসাদের ঘরে গিয়ে তাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাও। পরে আবার আমাকে তোমার ঘরে কফি খাবার সময় বললে রেডিও শুনতে শুনতে তোমার স্ত্রী হঠাৎ আর্তনাদ শুনতে পেয়ে তোমাকে নীচে পাঠায়। যে যুক্তিতে বর্ষার রাতে দরজা জানালা বন্ধ থাকায় তোমার অন্য ভাড়াটেরা প্রসাদজীর আর্তনাদ শুনতে পায়নি, সেই যুক্তিতে ঘরের দরজা জানালা বন্ধ থাকা এবং ফুল ভল্যুমে রেডিও চলা সত্বেও প্রসাদজীর আর্তনাদ তোমার স্ত্রী কি করে শুনতে পেল তা ভেবে পাচ্ছি না।

ট্যাগুন লাফিয়ে উঠল—তার মানে তুমি কি আমাকে সন্দেহ করছ?

বসো বসো, অত উত্তেজিত হয়ো না। যা ঘটেছিল ঠিক ঠিক বলো। আমার মনে হচ্ছে তুমি কিছু একটা আমার কাছে লুকচ্ছো। আচ্ছা বলতো, জয় বিশোয়াল রঘুবীর প্রসাদকে মার্ডার করে না হয় পালাল, কিন্তু সে যে তার যথাসর্বস্ব সিন্দুক ভেঙে নিয়ে পালিয়েছে তা তুমি জানলে কি করে? সিন্দুক তো ঘরের এক কোণে কভার ঢাকা থাকে। ও তো তোমার দেখবার কথা নয়।

তুমি বড় রহস্যময় হয়ে উঠছ। প্লিজ, একটু খুলে বলো কি তুমি বলতে চাও। আমার মনে হচ্ছে এই খুনের ব্যাপারে তুমি আমাকে জোর করে জড়িয়ে দিতে চাইছ।

আমি শুধু জিজ্ঞাসাবাদ করছি তোমাকে। যাক গে, তোমার যখন শুনতে কষ্ট হচ্ছে তখন আগের কথাতেই ফিরে যাই। সুকুলজী ছাড়া তোমাদের পরিচিতদের মধ্যে আর কার গাড়ি আছে বললে না তো?

আমি এই মুহূর্তে কিছু মনে করতে পারছি না।

তোমার নিজেরও তো একটা গাড়ি আছে।

আছেই তো। সেজন্যে কি ঐ অপরাধের বোঝাটা আমাকেই মাথা পেতে নিতে হবে?

না না, তা কেন? আমি কিন্তু ঘটনাকে এইভাবে খাড়া করেছি। একটু মন দিয়ে শোনো তো ঠিক মতো হয়েছে কিনা? কাল রাতে

দুর্যোগ চলাকালীন সময়ে এক অজ্ঞাত আততায়ী বন্ধুর মুখোস পরে প্রসাদজীর ঘরে ঢোকে। সে এমনই এক বন্ধু যে প্রসাদজীর সিন্দুকের সম্পদ সম্বন্ধে যথেষ্ট অবহিত ছিল। তারপর সে বেশ মোটা সোটা কোন লৌহদণ্ড অথবা ভোঁতা কুরুল জাতীয় কিছু দিয়ে সোফায় বসে থাকা প্রসাদজীর মাথায় সজোরে এমনভাবে আঘাত করে যাতে টুঁ শব্দটি করবার একটুও সুযোগ না পায় প্রসাদজী। এবং তারপরই বন্ধুবর কিচেনে ঢুকে অতিথি সৎকারের আয়োজনে রত জয় বিশোয়ালকেও ঐ একইভাবে আক্রমণ করে। অপেশাদার খুনি লোভের বশবর্তী হয়ে কি করবে কিছু ভেবে না পেয়েই জয়কে টেনে বাথরুমে রাখে। তারপর সিন্দুক ভেঙে সব কিছু আত্মসাৎ করেই আগাগোড়া সমস্ত পাপ জয় বিশোয়ালের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টা করে। এবং সেই জন্যই মোটরের পিছন দিকের ডালা তুলে তাকে তার ভিতরে ঢুকিয়ে রাখে। পরে বর্ষণমুখর রাতে নির্জন বঙ্কিম সেতুর ওপর তার প্ল্যান খাটায়।

অর্থাৎ তুমি বলতে চাও সেই অজ্ঞাত আততায়ী আমি নিজে।

তা বলছি না। তবে তোমার মোটরের পিছন দিকে বেশ কিছু চাপ চাপ রক্ত পড়ে আছে।

ট্যাণ্ডন চিৎকার করে উঠল—প্লিজ স্টপ। তুমি আগাগোড়া বন্ধুর মুখোস পরে আমাকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করছ। তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু হলে এমনটি কি ভাবতে পারতে না আমাকে বিপদে ফেলার জন্য আমার গাড়িটা নিয়ে কেউ ওরকম করেছে?

আরে! তাইতো আমি ভাবছি। না হলে তো তুমি এতক্ষণে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে?

সত্যি! সত্যি বলছ তুমি?

তুমি বড় ঘাবড়ে যাচ্ছো ভোলা। এত নার্ভাস হবার কি আছে?

আমার যে মাথা ঘুরছে।

এ রকম সময়ে ও রকম হয়। কাল তোমার বাথরুমে ঢুকে বেসিনে রক্ত দেখে আমি খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। বাথরুমের এক কোণে

তোমার রক্তমাখা জামা কাপড়ও আমি জড় করা অবস্থায় দেখতে পেয়েছি।

তপতী হঠাৎ 'উঃ মাগো' বলে বিছানায় লুটিয়ে পড়ল।

আমি বললাম—এতক্ষণ তো আমি বকলাম। এবার তোমার কি বক্তব্য একটু শুনি ?

বক্তব্য আমার একটাই। তোমার অনুমান ঠিক। হঠাৎ লোভের বশবর্তী হয়ে খুন আমিই করেছি। আমি তোমাকে অনেক টাকা দেবো চ্যাটার্জী। প্লিজ, এ যাত্রা আমাকে বাঁচাও।

টাকা নিয়ে আমি কি করব ভাই ? প্রসাদজীর মতো নিজের মৃত্যুকে ডেকে আনব ?

তা কেন ? দু'হাতে লোককে বিলোবে। এই দেখ কত টাকা আমার। বলেই খাটের ওপর বালিশের পাশে বেড-কভার ঢাকা স্বর্ণালঙ্কার সহ প্রচুর টাকা আমাকে দেখাল ও।

ও টাকা নিশ্চয়ই প্রসাদজীর ?

হ্যাঁ। আগে তাই ছিল। তারপর আমি নিয়েছিলাম। এখন ও সব তোমার। ওগুলো নিয়ে তুমি আমাকে রেহাই দাও।

আরে কি আশ্চর্য ! প্রসাদজীর মেয়ের বিয়ে। ও টাকা আমি নিয়ে কি করব ? তাদের টাকা তাদের ফেরৎ দিতে হবে না ?

তার মানে তুমি আমাকে ফাঁসীর দড়িতে লটকাতে চাও ?

সেটা তো আদালত ঠিক করবে।

ট্যাগুন হঠাৎ ওর টেবিলের ড্রয়ার টেনে একটা রিভলভার বার করে তাগ করল আমার দিকে। এত তাড়াতাড়ি এবং এমনই আচমকা যে আমি কিছু বার করবার সময়ই পেলাম না। ট্যাগুন রিভলভারটা আমার কপালে ঠেকিয়ে বলল—তাহলে জেনে রাখো বন্ধু আজই তোমার শেষ দিন। কেননা যে মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় এক রাতে দু'দুটো খুন করতে পারে তার কাছে তৃতীয় খুনটাও কিছু কঠিন নয়। সবাই জানে তুমি বর্ধমানে গেছ। কিন্তু আমি তোমাকে মেরে টুকরো টুকরো করে বস্তায় পুরে পাথর বেঁধে হাওড়ার ব্রীজ থেকে গঙ্গার জলে ফেলে

দেবো। অবশ্য এখনই নয়। গভীর রাতের অন্ধকারে।

বলো কি! কিন্তু ট্যাগুন তুমি বড়ই নির্বোধ। আমাকে মেরেও কি তুমি রেহাই পাবে ভেবেছ? আমার লাশ নিয়ে তুমি ঘর থেকে বেরোবে কি করে? একবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখো চারিদিকে থিক থিক করছে পুলিশ। তোমাদের মতন ছুটি সোনালী মাছকে ধরবার জন্য কি চমৎকার জাল আমরা পেতেছি দেখো। আর এই দরজাটা খোল। খুললেই দেখবে মিঃ কাঞ্জিলাল হাতে হাতকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তোমার জন্য।

ভোলা ট্যাগুন আমার কপাল থেকে রিভলভারের নলটা সরিয়ে নিয়ে জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেল আমার কথা সত্যি কিনা। দেওয়াল ঘড়িতে তখন টিক টিক শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দই শোনা যাচ্ছিল না সেই দারুণ নিস্তব্ধতায়।

galpochhabi.blogspot.in

১

ঘাটশিলায় আমি অনেকবার গেছি। তবুও ঘাটশিলার আকর্ষণ আমার কমেনি। যত দিন যায় ততই নতুন নতুন রূপে ঘাটশিলাকে দেখি। ঘাটশিলা থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে বহরাগোড়াটা কিছুতেই দেখা হয় না। কি যে আছে সেখানে জানি না। তবে বহরাগোড়া নামটার সঙ্গে একটা আরণ্যক পরিবেশ কল্পনা করি। চারিদিকে পাহাড়, শালবন, মাঝে আদিবাসী অধ্যুসিত ছোট্ট একটি গ্রাম, এই নিয়েই হয়তো বহরাগোড়া। তাই বহরাগোড়ার আকর্ষণ আমার খুব।

রাত্রি তখন নটা। আমার মৌড়িগ্রামের বাড়িতে ইজিচেয়ারে বসে মৌজ করে একটা রোমহর্ষক উপন্যাস পড়ছি। এমন সময় কলিং বেলটা বেজে উঠল। এত রাতে কে রে বাবা!

মৌড়িগ্রামে আমার নিরালাবাসে রাত নটা অনেক রাত। সন্ধ্যের পর থেকেই এখানে শেয়ালের ডাক শোনা যায়। কখনো দিন দুপুরেও ডাকে। এই অসময়ে কে আসে? যাই হোক, বই মুড়ে রেখে ধীরে ধীরে উঠে গিয়ে দরজা খুলেই অবাক হয়ে গেলাম—একি পলাশবাবু!

পলাশবাবু আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধু। বয়সেও দু'চার বছরের বড়। কাঁধে একটি ঝোলা ব্যাগ নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছেন।

আসুন ভেতরে আসুন।

পলাশবাবু ঘরে ঢুকে কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা বিছানায় ছুঁড়ে দিয়ে আমার সোফা কাম বেডে দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললেন—ভগবানকে

ডাকতে ডাকতে আসছি। আপনার যেন দেখা পাই।

বললাম—আপনার অনেক পরিবর্তন হয়েছে দেখছি। আপনি ভগবানকে ডেকেছেন এটা কিন্তু আমার বিশ্বাস হয় না।

বিশ্বাস করুন আর না করুন সত্যিই ডেকেছি। সামনে চারদিন ছুটি। এই গুমোট গরমে ঘরে থাকা অসম্ভব। আপনারও ছুটি নিশ্চয়ই। তাই চলুন আজ রাতে অথবা কাল সকালে দিন চারেকের জন্যে কোথাও একটু কেটে পড়ি।

অসম্ভব।

প্লিজ। আমি উইথ ব্যাগ এ্যাণ্ড ব্যাগেজ ঘর থেকে বেরিয়েছে। আপনি না গেলে আমি একাই যাব। অনুগ্রহ করে এই চারদিন আপনি আমাকে সঙ্গ দিন।

কিন্তু···।

কোন কিন্তু রাখবেন না ব্রাদার। আপনি আমাকে অনেকবার বলেছিলেন ঘাটশিলা নিয়ে যাবেন। এই সুযোগ।

সবই বুঝলাম। তবে মুসকিলটা কি জানেন? এই ভয়ঙ্কর ভ্যাপসানি গরমে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবেন না। আর কোথাও গিয়ে যদি একটু খোলা মন নিয়ে খোলা হাওয়ায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ঘুরে বেড়াতে না পারি তাহলে ঘর থেকে বেরিয়েই বা লাভ কি বলুন?

ভুলে যাচ্ছেন এটা কিন্তু ভাদ্রের শেষ। শরৎকাল।

ঠিক আছে। কিন্তু শরৎ কি এ বছর শরতের রূপে দেখা দিয়েছে? আকাশে মেঘের ছিটেফোঁটা নেই। গুমোট গরম। অসম্ভব চড়া রোদ। তার ওপর নদীগুলো শ্রাবণের অবিশ্রান্ত ধারাপাতে দু'কূল ভরা।

বেশ। তাহলে আমি একাই যাচ্ছি। আপনি টাইম টেব্‌ল দেখুন। আজ রাতে ঘাটশিলা যাবার কোন গাড়ি আছে কিনা দেখে বলুন।

আমি বললাম—আরে মশাই, গেলে দুজনেই যাব। একা আপনি যাবেন কেন? তবে এই গরমে চড়া রোদ্দুরে একটুও ঘুরতে পারবেন

না। স্বুবর্ণরেখায় নাইতে পারবেন না।

তবু যাবো।

তাহলে আজকের রাত্রিটা বিশ্রাম নিন। কাল সকালেই যাব আমরা।

আঃ বাঁচালেন।

আমি স্টোভ জ্বেলে চা বসালাম। পলাশবাবু ডিম খেতে ভালো-বাসেন। তাই দুজনের জন্যে দুটো ডিমের ওমলেট আর চা।

পলাশবাবু বললেন—আপনিও অবিবাহিত। আমিও বিয়ে করিনি। তবু মশাই আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। সরকারি চাকরি করেন। বেসরকারিভাবে গোয়েন্দাগিরি করেও যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু আমার জীবনটা বড়ই মিজারেবল্। নিজে বিয়ে না করেও ভাইয়ের সংসার টানছি। আর সব চেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন? যাদের জন্য সারা জীবন ধরে তিল তিল করে নিজেকে সার করলাম তারাই এখন উপার্জন কম করি বলে আমাকে সন্দেহ করে। ওদের ধারণা আমি নাকি ইচ্ছে করে কম খরচ করি। আমার ব্যাঙ্কে যে কটা টাকা আছে সেগুলো আত্মসাৎ না করা পর্যন্ত ওদের শান্তি নেই। আমার ভাইপো বম্বে যাবে বলে আমার কাছে পাঁচ হাজার টাকা চেয়েছিল। আমি দিইনি বলে আজ আমাকে কি অপমানটাই না করেছে। আপনি বিশ্বাস করুন চ্যাটার্জীবাবু, এক এক সময় মনে হয় আমি স্যুইসাইড করি। যখন মরিশন কোম্পানিতে চাকরি করতাম তখন দু'হাজার টাকা মাইনে পেতাম। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে দু'হাজার টাকার দাম নেহাৎ কম ছিল না। তখন সব টাকা ওদের ধরে দিয়েছি। নিজের বলতে কিচ্ছু রাখিনি। এখন ছশো টাকা মাইনে পাই। পাঁচশো টাকা ওদের দিই। তাতে ওদের মন ভরে না। দুপুরে দুটি ভাত আর রাত্রে চারখানা রুটি খেতে দেয়। জল খাবার পাই না। চা পাই না। অথচ কোলে-পিঠে-বুকে করে মানুষ করেছি ওদের, তাই ছেড়েও যেতে পারি না। এ অবস্থায় বেঁচে থেকে লাভ কি বলুন? কদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল এই চার দেওয়ালের গণ্ডীর বাইরে

কোথাও থেকে একটু ঘুরে আসি। সামনে চারদিন ছুটি। এটাকে কাজে লাগাতে চাই। মনে হল আপনার কথা। চলে এলাম তাই।

আমি পলাশবাবুর দিকে ওমলেট আর চা এগিয়ে দিয়ে নিজেও খেতে লাগলাম। খেতে খেতেই বললাম—সব মানুষের জীবনেই একটা না একটা ট্রাজেডি আছে। আমারও যে নেই তা নয়। তবে এখন আমি মুক্ত। বিয়ে থা করিনি কারণ গোয়েন্দাগিরি করতে গিয়ে বিভিন্ন চক্রান্তের জালে যখন তখন এমনভাবে জড়িয়ে পড়ি তাতে যে কোন সময় জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই বেশ আছি।

তাহলে যাওয়ার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত তো?

এর পরে আর না বলি কি করে? আমি নিজেও একজন ভ্রমণ রসিক লোক। ঘোরার ব্যাপারে আমার কোন ক্লান্তি নেই। চলুন দু'দিন ঘুরে আসি। রোদ্দুরের সময় বাইরে না বেরোলেই হল।

আমার অনেক দিনের আশা ছিল ঘাটশিলা যাবার।

আমিও ঘাটশিলা থেকে একবার বহরাগোড়া যাবার কথা ভাবছিলাম। চলুন এই সুযোগে বহরাগোড়াটাও ঘুরে আসি।

আপনি আমাকে যেখানে যেতে বলবেন সেখানেই যাব।

সে আমি জানি এবং সেইজন্যেই সঙ্গী হিসাবে আপনাকে পেলে আমার খুব আনন্দ হয়। তাছাড়া আপনার মানসিকত'র সঙ্গে আমার মানসিকতাও মিলে যায়। আপনি আমার উপযুক্ত ভ্রমণসঙ্গী।

গল্প করতে করতে এবং সব কিছু গুছিয়ে-গাছিয়ে নিতে অনেক রাত হয়ে গেল। তাই ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে শুয়ে পড়লাম দুজনে।

ঠিক সাড়ে তিনটে নাগাত এলার্ম বেজে উঠল।

আমরা উঠে মুখ-হাত ধুয়ে একটু চা খেয়ে নিয়ে চললাম ট্রেন ধরতে। মৌড়িগ্রাম থেকে চারটে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ নাগাত হাওড়া যাবার একটি লোক্যাল ট্রেন পাওয়া যায়। সেই ট্রেনে হাওড়া গিয়ে সকাল ছ'টা দশের ইস্পাত এক্সপ্রেস ধরতে হবে। গাড়ি লেট না করলে দশটার মধ্যেই পৌঁছে যাব ঘাটশিলায়।

ঘাটশিলা।

নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেন এসে ঘাটশিলায় থামল। আমরা ট্রেন থেকে নেমে দু'পায়ের রাস্তা হেঁটে মাড়োয়ারী ধর্মশালায় গিয়ে উঠলাম। ধর্মশালাটি মন্দ নয়। আলো পাখা তক্তাপোষ সব কিছুই আছে এখানে। দৈনিক ভাড়া পাঁচ টাকা।

যাই হোক। আমরা ধর্মশালায় ঘর নিয়ে ইঁদারার জলে স্নান করে স্টেশনের কাছেই একটি হোটেলে পেট ভরে খেয়ে বহরাগোড়ার মিনিতে উঠলাম। উঃ, সে কি প্রচণ্ড গরম। গল গল করে ঘাম ছুটতে লাগল গা দিয়ে। মাথা ঘুরতে লাগল।

এক সময় মিনিবাস ছাড়ল। এইবার একটু হাওয়া লাগল গায়ে। মিনিবাস ছেড়ে ফুলডুংরি পাহাড়ের পাশ দিয়ে কাশীদার ওপর দিয়ে তামুকপাল ছুঁয়ে ক্রমশ ধলভূমগড়ের দিকে এগোতে লাগল।

স্বপ্নের জাল ছিঁড়ে যেতে লাগল ক্রমশ।

এতো কলকাতার দিকেই এগোচ্ছি। যত যাচ্ছি ততই পাহাড়-জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে। একজন সহযাত্রী আমাদের কথাবার্তা শুনে বললেন—আপনারা আর বেড়াতে যাবার জায়গা পেলেন না মশাই? কি আছে কি বহরাগোড়ায়? মুঠোর মধ্যে ধরা যায় এমন একটি ছোট্ট গ্রাম ছাড়া কিছুই নেই সেখানে। তার চেয়ে আপনারা বরং ধলভূমগড়ে নেমে যান। অথবা নরসিংগড়ে। সেখানে পুরনো রাজবাড়ির ধ্বংসাবশেষ দেখলে অতীত স্মৃতিতে মন ভরে যাবে।

পলাশবাবু বললেন—কি করবেন তাহলে?

বললাম—কিছুই না। টিকিট কেটে উঠে যখন পড়েছি তখন বহরাগোড়ার চেহারাটা একটু দেখেই যাই। ভালো যদি না লাগে তাহলে এই বাসেই ফিরে আসব। আর হাতে সময় থাকলে নরসিং গড়টাও ঘুরে আসব একটু।

ভদ্রলোক বললেন—খুব সময় থাকবে। এখন ভাদ্র মাসের বেলা। তাছাড়া রাত নটা পর্যন্ত বাস চলে এই পথে।

আর একজন সহযাত্রী বললেন—আজকে নটা অব্দি চলবে না। আজ মহরম। অনেক বাস বন্ধ আছে আজকে।

তবু সন্ধ্যে পর্যন্ত ঘুরলে একটা না একটা বাস পাবেনই। মিনি, টেম্পো, বাস। কিছু না পেলে লরীও আছে।

আমি বললাম—বাস রাস্তা থেকে নরসিংগড়ের রাজবাড়ি কতদূর?

সামনেই। দশ মিনিটের পথ। যাকে বলবেন সেই দেখিয়ে দেবে। তাছাড়া আমি তো ওখানকারই লোক।

পলাশবাবু বললেন—তাহলে তো কথাই নেই। ফেরার বাস না পেলে আপনার বাড়িতেই উঠব।

ভদ্রলোক অমায়িকভাবে হেসে বললেন—সে সৌভাগ্য কি হবে আমার? আপনারা যদি আসেন তো বলুন। আমি আপনাদের থাকার জন্য ব্যবস্থা করি।

পলাশবাবু বললেন—আমরা যাবোই। আপনি ব্যবস্থা করুন। যদি ফেরার বাস না পাই তাহলে আপনার ওখানেই উঠছি কিন্তু। মহাশয়ের নাম?

আমার নাম বাসুদেব চক্রবর্তী। আপনাদের?

আমার নাম পলাশ মজুমদার। আর আমার এই বন্ধুটির নাম অম্বর চ্যাটার্জী। আমি একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করি। আর ইনি সরকারী চাকরি করেন। সেই সঙ্গে করেন সখের গোয়েন্দাগিরি।

বাসুদেববাবু অবাক বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—সত্যি!

আপনাকে মিথ্যে বলে লাভ?

বাসুদেববাবু উঠে দাঁড়ালেন এবার। বললেন—আমি আপনাদের জন্য অপেক্ষা করব কিন্তু। অনুগ্রহ করে আসবেনই। নরসিংগড় আসছে। আমি নেমে যাই।

বাস থামল। বাসুদেববাবু বাস থেকে নেমে আবার বললেন—দেখবেন, যেন ভুলে যাবেন না। তারপর কেমন যেন করুণ চোখে আমার

দিকে চেয়ে বললেন—আপনাকে আমার বিশেষ প্রয়োজন চ্যাটার্জী বাবু। অনুগ্রহ করে গরীবের বাড়িতে একটু পায়ের ধুলো দেবেন। আমার খুব বিপদ। আপনি এলে সব বলব। যদি আপনি বাঁচাতে পারেন আমায়।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। বাস ছাড়লে পলাশবাবুকে বললাম—আপনি মশাই একেবারে ছেলেমানুষ। সকলকে সব কথা বলে কখনো? এলাম কোথায় বেড়াতে, ত না এখানেও রহস্যের জাল?

কি আর করবেন বলুন? কথায় আছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। এড়িয়ে যেতে চান, না নামলেই হবে।

তাই কি পারি? মানুষকে কথা দিয়ে কথার খেলাপ করি কি করে?

কিছু সময়ের মধ্যে আমরা বহরাগোড়ায় পৌঁছে গেলাম। সত্যি সত্যিই মুঠোর মধ্যে ধরা যাবে এমন একটি গ্রাম। হয়তো এই জায়গাটার এমন বিশেষ কোন গুরুত্ব আছে যা আমরা জানি না। কিন্তু সেই গুরুত্বের কথা জানতে চাইও না আমরা। এই নামটার সঙ্গে যে আরণ্যক গন্ধ ছিল তাও বিলীন হয়ে গেল। একেবারে ফাঁকা জায়গা। ধারে-কাছে কোন অরণ্য যা দেখে চোখ জুড়োয় এমন কোন প্রাকৃতিক শোভা নেই। টিলা পাহাড় তো দূরের কথা, টিলা পাহাড়ের একটু অস্পষ্ট রেখাও এখানে চোখে পড়ে না।

পলাশবাবু বললেন—এই আপনার বহরাগোড়া? কি আছে এখানে?

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। দারুণ ঠকলাম তো। এই অসহ্য রোদের উত্তাপ নিয়ে এতদূর আসাটাই বেকার হয়ে গেল। ঠিক আছে। এখানে আর অযথা সময় নষ্ট করা নয়। চলুন এই বাসেই ফিরে যাই।

কোথায় যাবেন? নরসিংগড়?

হ্যাঁ। বাসুদেববাবুর নিমন্ত্রণটা রক্ষা করে আসি।

সময় কাটাবার জন্য একটি দোকানে বসে এক কাপ করে চা খেয়ে আমরা সেই বাসেই নরসিংগড়ে ফিরে এলাম।

বাস থেকে নামতেই চমৎকার পটভূমি দেখে মনটা ভরে উঠল। লাল মাটির আঁকাবাঁকা পথ গাছপালার ফাঁক দিয়ে গ্রামের বুকে হারিয়ে গেছে।

গ্রামে পৌঁছে বাসুদেববাবুর নাম করতেই একজন লোক আমাদের বাসুদেববাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিল।

বেশ অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি। মনে হয় একসময় এনারা হয়তো এখানকার জমিদার ছিলেন। বাসুদেববাবু দোতলার জানলা থেকে আমাদের দেখতে পেয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন অভ্যর্থনা করতে—আরে আসুন, আসুন। কি সৌভাগ্য আমার। আপনারা যে সত্যিই আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন তা কিন্তু ভাবতেও পারিনি।

আমরা বাসুদেববাবুর সঙ্গে ভেতর বাড়িতে গেলাম। বাইরের থেকে ভেতরটা আরো চমৎকার। দেখে মুগ্ধ হয়ে বললাম—আপনি তো দেখছি রাজা লোক মশাই?

বাসুদেববাবু হাসলেন। বললেন—এক সময় ছিলাম। তবে এখন তালপুকুরে ঘটি ডোবে না। কলসীর জল গড়িয়ে খেতে খেতে সব শেষ।

পলাশবাবু বললেন—এখানে যে পুরনো রাজবাড়ি দেখতে আসে লোকে সে কি আপনাদেরই।

বাসুদেববাবু বললেন—আরে না না। ও হল ধলভূমগড়ের রাজাদের প্রাসাদ। আমরা তাদের দাসানুদাস। তবে একসময় কেউকেটা ছিলাম। এখন এই সম্পত্তি রক্ষা করাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সেকি! সরকার নিয়ে নিচ্ছে নাকি?

না না। এটা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। একটু জলটল খান। বিশ্রাম করুন। রাত্রিবেলা সব বলব আপনাদের। আমি এখন এমনই এক পরিস্থিতির মধ্যে আছি যে আমার জীবনও এখন বিপন্ন। আমার ভাই, নিজের মায়ের পেটের ভাই—

এমন সময় এক মধ্যবয়সী সুন্দরী মহিলা খাবারের প্লেট নিয়ে ঘরে

ঢুকলেন। তারপর টেবিলের ওপর সেগুলো নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন—আসুন একটু এদিকে আসুন আপনারা। মুখ হাত ধুয়ে নিন। তারপর খেতে খেতে যত ইচ্ছে গল্প করবেন।

বাসুদেববাবু বললেন—হ্যাঁ হ্যাঁ। ঠিক বলেছেন উনি। চলুন। কল ঘরটা ওদিকে। মুখ হাত ধোবেন চলুন।

আমরা তাঁদের কথা মতো কলঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে খাবার টেবিলে এসে বসলাম। অতি উপাদেয় হালুয়া পুরী আর রসগোল্লা প্লেটে সাজানো ছিল। তাই খেয়ে চা খেলাম।

বাসুদেববাবু বললেন—আমার স্ত্রী। সৌদামিনী। আমার অবর্তমানে কি যে হবে বেচারির তা কে জানেন।

আপনি এখনই এত অধীর হচ্ছেন কেন? মরবার বয়স এখনো হয়নি আপনার।

কি যে বলেন আপনি। সত্যিই ছেলেমানুষ। মরার কি বয়স লাগে মশাই? অনেক সময় একটা হাই তুলতে গেলেও মানুষের স্ট্রোক হয়ে যায়। বিশেষ করে আমার জীবন এখন পদ্মপাতায় জলের মতন। সব বলব আপনাকে। বলব বলেই এত করে আসতে অনুরোধ করেছি। চলুন এখন বেলা থাকতে থাকতে রাজবাড়িটা আপনাদের দেখিয়ে আনি। খুব ভালো লাগবে। ভোর হলেই পাখি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি মর্নিং ওয়াক করতে চলে যাই ঐ রাজ-বাড়ির দিকে তখন পুরনো ইতিহাসের পাতায় মন আমার হারিয়ে যায়। কি দারুণ সুখের দিন ছিল সে সব। যাক। কথায় কথায় বেলা গড়িয়ে আসছে। চলুন আমরা যাই।

আমরাও যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।

দরজার আড়াল থেকে সৌদামিনী দেবী বললেন—বেশি সন্ধ্যে কোর না যেন। আমার বাপু ভয় করে।

আমি বললাম—কিসের ভয়?

আমার ভাই আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছে, তাই। ইদানিং ও আমাকে খুব চোখে চোখে রাখে।

পলাশবাবু বললেন – ঠিকই করেন। কেউ যদি কিছু করব বলে শাসিয়ে থাকে তাহলে একটু সাবধানে চলাফেরা করাই ভালো। কেননা এখনকার মানুষকে বিশ্বাস নেই।

আমি এই ব্যাপারটা কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা ভাবতে ভাবতে বাসুদেববাবুর সঙ্গে পথ চলতে লাগলাম। এপথ সেপথ করে সামান্য একটু যাবার পর একটি মন্দির চোখে পড়ল। শিব মন্দির। স্থানীয় মহিলারা পূজো দিতে এসেছেন কেউ কেউ। সে মন্দির বাঁয়ে রেখে বাঁদিকে একটু বেঁকে এক আদিবাসী পল্লী পার হতেই ধলভূম রাজ-বাড়ির ধ্বংসস্তূপের কাছে এসে পৌঁছলাম। সত্যিই রমণীয় স্থান। রাজাদের পুরনো রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি আজও আছে। নিত্য পূজা হয় সেখানে। তারপর সবই ভেঙেচুরে পড়ে আছে। রাজবাড়ির মূল প্রাসাদটিরও অবস্থা তথৈবচ। তবে এটি একেবারে ভেঙে পড়েনি। এর দোতলার ছাদে কিছু ছেলেমেয়ে খেলা করছে দেখলাম। শুনলাম বাড়িটিতে স্থানীয় অনেক লোকজন এখন ভাড়া থাকেন।

রাজবাড়ি দেখে ফিরতেই সন্ধ্যে হয়ে গেল।

সৌদামিনী দেবী আনচান করছিলেন। আমরা যেতেই বললেন —শশাংক এসেছিল। বলল, আমার পিছনে সি. আই. ডি লাগান হয়েছে? ওরা এলে বলে দিও যদি ওরা নিজেদের মঙ্গল চান তাহলে যেন আজই চলে যান এখান থেকে।

বাসুদেববাবুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললেন—তাই নাকি?

সৌদামিনী দেবী বললেন—আসলে তুমি একটি বোকা লোক। বাড়িতে কে আসছেন না আসছেন সে কথা লোকের কাছে বলতে যাও কেন?

বাসুদেববাবু বিস্মিত হয়ে বলল—কি আশ্চর্য! আমি কাউকে কিছুই বলিনি।

ও তাহলে জানতে পারল কি করে?

আমি বললাম—সম্ভবতঃ ঘাটশিলা থেকে যে বাসে আমরা বহরাগোড়া যাচ্ছিলাম সেই বাসেই ওর কোন লোক ছিল। আমাদের

আলাপ পর্ব হয়তো সে শুনেছে।

পলাশবাবু বললেন—হ্যাঁ, তা হতে পারে। তাহলে এখন আপনারা আমাদের কি করতে বলছেন?

বাসুদেববাবু বললেন—কি বলি বলুন তো? চলেই যান বরং। আমার ভাই তো নয়। সাক্ষাৎ শয়তান। যদি কিছু করে বসে।

সৌদামিনী দেবী বললেন—আমিও তাই বলি। পরের ছেলে বেড়াতে এসে কেন বিপদে পড়বেন?

পলাশবাবু বললেন—অবজেকশন। আমি কিন্তু ছেলে নই। এখন আমি রিটায়ার্ড ম্যান। তবে অম্বরবাবুর ব্যাপার আলাদা। স্মার্ট ইয়ং ম্যান।

আমি বললাম—আপনাদের এখানে মুরগি পাওয়া যায়?

কেন বলুন তো?

যদি আপনাদের দিক থেকে কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে মুরগির মাংস আর ভাত করুন। আজ রাত্রে পেট ভরে মাংস ভাত খেয়ে এখানে ঘুমবো।

তাহলে আপনারা যাবেন না?

পলাশবাবু চাপা গলায় বললেন—কি ছেলেমানুষী করছেন? অযথা পরের ব্যাপারে নাক গলিয়ে লাভ কি? এলাম কোথায় বেড়াতে। এখন কেটে পড়ুন তো মশাই।

আমিও চাপা গলায় বললাম—এসে যখন পড়েছি আর তা হয় না। বাসের ভেতর লোককে শুনিয়ে পরিচয় দিতে কে বলেছিল? আমি? এখন ঠ্যালা সামলান।

—সত্যি, এমন যে হবে তা আমি ভাবিনি চ্যাটার্জীবাবু।

আমি বললাম—সব কিছুরই শেষ আছে। কাজেই যা হবার তা হোক। আমরা এখানে থেকেই যাচ্ছি। মনে হচ্ছে নাটক এখানে ভালোই জমবে।

বাসুদেববাবু আনন্দে অধীর হয়ে আমাদের দোতলায় নিয়ে গেলেন। তখন চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেছে। তবে এ বাড়িতে ইলেকট্রিক

থাকায় আলোর অভাব হল না।

একটি বড় ঘর দেখিয়ে বললেন—এটাতে আপনাদের থাকবার ব্যবস্থা করেছি!

বনেদী বড়লোকের ঘর বাড়ি যেমন হয় এ বাড়িটিও ঠিক তেমন। মেহগনি কাঠের খাট। আলমারী। দেওয়ালে পিতৃপুরুষদের তৈল চিত্র। সবই আছে। ঘরে ঢোকার মুখে দরজার মাথায় শিংওয়ালা হরিণের মুখ। একসময় এ সব অঞ্চলে প্রচুর হরিণ ছিল। সেই হরিণ শিকার করে এদেরই পূর্বপুরুষরা কেউ ওভাবে সাজিয়ে রেখেছেন ওটিকে।

galporchhabi.blogspot.in

সে রাতে আমরা তিনজনে জোর গল্পে মেতে উঠলাম। বাসুদেব-বাবু সত্যিই মিশুকে এবং অমায়িক লোক। কয়েক ঘণ্টা আগে যে কেউ কাউকে চিনতাম না তা বলে মনেই হল না। যাই হোক, ওঁর ভাইয়ের ব্যাপারে বাসুদেববাবু যা বললেন তা হল এই—

বাসুদেববাবুরা চার ভাই। বড় ভাই সর্পাঘাতে মারা গেছেন। মেজো আছেন আমেরিকায়। বাসুদেববাবু সেজো। আর ছোট ভাই শশাংক যৌবনে এক বিবাহিতা রমণীকে নিয়ে দেশ ছেড়ে যায়। এই শশাংকই এখন ধূমকেতুর মতো হঠাৎ ফিরে এসে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে। অর্থাৎ বাসুদেববাবু তাঁর সারা জীবনের সঞ্চয় দিয়ে এই বাড়িকে রক্ষণা-বেক্ষণের পর ভাই এসে বাড়ির অংশ দাবী করছে।

সব শুনে পলাশবাবু বললেন—করুক না। পৈতৃক সম্পত্তির ওপর সকলেরই সমান অধিকার। তার অংশটা তাকে দিয়ে দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।

বাসুদেববাবু বললেন—যায় না। তার কারণ এ বাড়িতে তার কোন অংশ নেই।

—সেকি!

—হ্যাঁ। আমার বড়দা মারা যাবার পর সম্পত্তির দাবীদার আমরা তিন ভাই। মেজদা আমেরিকায় নাগরিকত্ব পেয়ে বসবাস করছেন। উনি লিখিতভাবে জানিয়েছেন এ দেশে আর কখনো

ফিরবেন না এবং সম্পত্তির কোন অংশ নেবেন না। আর ছোট ভাই? সে যাবার আগে আমাদের পিতৃপুরুষের সঞ্চিত সমস্ত সোনা-দানা এবং নগদ টাকা প্রায় দেড় লাখের মতো নিয়ে পালিয়ে যায়। এর ফলে সর্বস্বান্ত হয়ে যাই আমরা। ছোটভাই চলে যাবার পর আমার মা আত্মহত্যা করেন। আর বাবা? সমস্ত সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়ে প্রায় না খেতে পেয়ে মারা যান। সেই উইল এখনো আমার কাছে আছে।

আমরা অবাক হয়ে সব শুনলাম।

বাসুদেববাবু বললেন—বিশ্বাস করুন। ভাই আমাদের সর্বস্বান্ত করে দিয়ে চলে গিয়েছিল। ও চলে যাবার পর কয়েকটা বছর যে কি ভাবে কাটিয়ে ছিলাম আপনারা তা ভাবতে পারবেন না। এমনই দুঃসময় গেছে যে না খেয়েই অনেকদিন কেটেছে। অথচ না পেরেছি কুলিগিরি করতে, না লোকের কাছে ভিক্ষে চাইতে। তারপর যাই হোক ভগবানের কৃপায় নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছি। সুন্দরী বউ পেয়েছি। আর এই এতবড় বাড়িটাকে রক্ষণাবেক্ষণ করছি। এই বাড়িটাকে একবার হোয়াইট ওয়াশ করতে গেলে বিশ হাজার টাকা খরচা হয়। এর জানলা দরজা দেখছেন? এই সব কাঠ আর পাওয়া যাবে? এবার বলুন তো কত টাকা খরচা করলে এ জানলাকে রঙ করা যায়? সব আমার নিজের টাকায় করেছি। এখন কেন আমি সম্পত্তির ভাগ দেবো?

পলাশবাবু বললেন—না। দেওয়াটা উচিৎ নয়। তবে একটা কথা, নিজের ভাই তো? ও আপনার ছেলে হলে কি করতেন? তাকে কি ফিরিয়ে নিতেন না? সেই রকমই ভেবে ওকে ক্ষমা করে কিছু অংশ ওকে দিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন ওর রাগও কমবে এবং আপনারও জীবন বিপন্ন হবে না। আপনার ছেলেমেয়ে কটি?

—আমার দুই ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে দুটি বরোদায় থাকে। একজন এল. আই. সি'তে এবং অন্যজন ব্যাঙ্কে কাজ করে। মেয়েটির এক বছর হল বিয়ে দিয়েছি। ও এখন ওর শ্বশুরবাড়ি

দুর্গাপুরে আছে। ভাইকে সম্পত্তির অর্ধেক অংশ দেবার কথা বলছেন? প্রাণ থাকতে দেবো না। কারণ, এই সম্পত্তি তাকে লিখে দিলেই সে তার অংশ বিক্রী করে দেবে। ইতিমধ্যে দু'বার বিয়ে করেছে সে। অতএব তার চরিত্রটা যে কি রকম তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন? তাছাড়া কেনই বা দেবো বলুন তো? এই প্রাসাদকে যক্ষের মতো এতদিন ধরে আগলে রেখেছে কে? কে এর দেখা-শোনা করেছে? আমি না দেখলে এই প্রাসাদও একদিন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হোত।

আমি বললাম—ঘটনা যদি এই রকমই হয়, তাহলে বলব এ বাড়ি আপনি দেবেন না। তবে সাবধানে থাকবেন একটু। রাতে, ভোরে, অন্ধকারে অযথা নির্জনে যাবেন না। তা আপনার ভাই এখন কোথায় আছে জানেন?

না। তবে ও এখন একটা খারাপ দলের সঙ্গে মিশে চুরি ডাকাতি রাহাজানি এই সব করে বেড়াচ্ছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে। আশা করি আমরা এখানে দু'একদিন থাকলে ওর মোকাবিলা করতে পারব।

পলাশবাবু লাফিয়ে উঠলেন—আপনি পাগল হয়ে গেলেন নাকি মশাই?

—উঁহু। আমার মাথা গোল এবং পা লম্বা ঠিকই আছে। আপনি কাল সকালেই ঘাটশিলা থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে চলে আসুন। এখানে আমরা দিন কতক থাকব।

পলাশবাবু বললেন—আপনি থাকুন মশাই। আমি ওসবের ভেতরে নেই। বাসুদেববাবু যদি কোন লোককে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেন, আমি তার হাতে আপনার মালপত্তরগুলো পাঠিয়ে দেবো। কাল সকালেই আমি চলে যাবো এখান থেকে।

সে রাতে আমরা আর আলোচনা না বাড়িয়ে খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লাম। আঃ, কি গভীর ঘুমে দু'চোখ বুজে এলো আমাদের।

খুব ভোরে বাসুদেববাবু ঘুম থেকে উঠেই আমাদের ডেকে তুললেন। বললেন—চলুন না, একটু বেড়িয়ে আসি। এই ভোরে পাখির ডাক শুনে গাছ পালার সবুজ গন্ধ শুঁকে মনটাকে তাজা করে আনি। একা বেরোতে ভয় হয়। আজ যখন আপনারা আছেন তখন সে ভয় আর নেই।

আমি বললাম—বেশ তো চলুন না। ভোরে বেড়ানোর একটা আনন্দ আছে বৈকি।

পলাশবাবু ঘুমনোর ভান করে পড়েছিলেন। এবার একবার আড়ামোড়া ভেঙে বললেন—দয়া কার আমাকে বাদ দেবেন না স্যার। আমাকেও সঙ্গে নিন।

আমি বললাম—সে কি মশাই! আপনার তো আজ ঘাটশিলায় ফিরে যাবার কথা। আপনি আমাদের সঙ্গে গিয়ে কি করবেন?

আরে ঘাটশিলায় তো এখুনি যাচ্ছি না। বেলায় দেখা যাবে। এখন আপনাদের সঙ্গটা ছাড়ি কেন? আসলে আমি মশাই বেড়াতে এসেছি। কোন ঝুট-ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে সময় নষ্ট করাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করি না। তবে ঘটনা চক্রে জড়িয়ে যখন পড়লাম তখন আপনাকে এখানে একা রেখে আমি যাই কি করে?

এই এত ভোরেও বাসুদেববাবুর স্ত্রী সৌদামিনী আমাদের চা খাওয়ালেন। চা খেয়ে আমরা প্রাতঃভ্রমণে বেরোলাম। ভাদ্রের গুমোট গরম এখন নেই। শরতের শিশির ভেজা পথে এখন শিউলির ও বনপুষ্পের সৌরভ। তাছাড়া নতুন নতুন সবুজ পাতা যুক্ত গাছ-পালার গন্ধও মন প্রাণ যেন ভরিয়ে তুলল।

আমরা মেঠো পথ ধরে নরসিংগড়ের রাজপ্রাসাদের দিকে এগোতে লাগলাম। কিছু পথ আসার পর রাজবাড়ির কাছাকাছি একটি ভাঙা মন্দিরের পাশে আগাছার জঙ্গলে লক্ষ্য পড়তেই চমকে উঠলাম আমরা। দেখলাম একটি গর্ত মতো অংশে বুনো ঝোপঝাড়ের ওপর একটি মানুষের দেহ উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

আশ্চর্য তো ? কি করছে লোকটি ওখানে ? জীবিত না মৃত ?

বাসুদেববাবু বললেন—মনে হচ্ছে নেশা করে পড়ে আছে কেউ।

পলাশবাবু বললেন—উঁহু। আমার তো মনে হচ্ছে ডেড বডি ওটা।

অসম্ভব। ডেড বডি ওখানে কি করে আসবে ?

যে ভাবে আসে সেইভাবেই এসেছে। অর্থাৎ কেউ খুন টুন করে ফেলে রেখে গেছে।

বাসুদেববাবু বললেন—না না। এ আমি বিশ্বাস করি না। এখানে এরকম কোন ব্যাড এলিমেণ্টস্ নেই। অবশ্য আমার নিজের ব্যাপারটা ব্যক্তিগত। ভাই ভাই শত্রুতা। জানেন তো, জ্ঞাতি শত্রু বড় শত্রু, ভাই শত্রু মহাকাল।

আমি বললাম—যুক্তি এবং তর্কের কোন দরকার নেই। ওটা ডেড বডিই। দেখছেন না নড়াচড়া করছে না। চলুন তো কাছে গিয়ে দেখি।

আমরা দ্রুত পায়ে সেইদিকে এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলাম বাসুদেববাবু কেমন সেন বিমর্ষ হয়ে গেলেন। তাঁর মুখ পাণ্ডুর হয়ে গেল। তিনি ভীত সন্ত্রস্তভাবে সেই দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলেন নির্বাক হয়ে।

আমি বললাম—কি মশাই চেনেন নাকি ?

বাসুদেববাবু ধীরে ধীরে ঘাড় নাড়লেন—হ্যাঁ। আমার ছোট ভাই শশাঙ্ক।

বিনা মেঘে বজ্রপাত হলে লোকে যে ভাবে চমকায় আমরাও ঠিক সেইভাবেই চমকে উঠলাম—আপনার ভাই শশাংক !

হ্যাঁ।

কিন্তু এটা কি করে সম্ভব ! ও-ই তো আপনাকে খুন করবার জন্য সাঁসাচ্ছিল। মাঝখান থেকে ও নিজেই খুন হয়ে গেল !

পলাশবাবু বললেন—ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। আপনার তো ভালোই হল মশাই। এখন থেকে আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারবেন।

বাসুদেববাবু বললেন—কিন্তু পুলিশ। পুলিশ আমাকে নিশ্চিন্তে

থাকতে দেবে ? ওর সঙ্গে সম্পত্তির ব্যাপার নিয়ে এই বিরোধের কথা এখানকার সবাই জানে। এমন কি পুলিশের কাছেও এই ব্যাপারে রিপোর্ট পেশ করা আছে। এই সময় ওর এই খুন হয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে খুব একটা মঙ্গল জনক কি ? সবাই তো আমাকেই সন্দেহ করবে। ভাববে খুনটা আমি করিয়েছি।

পলাশবাবু বললেন—সে জন্য তো আমার বন্ধু আছে। তাছাড়া কাল সারারাত আমরা আপনার বাড়িতে ছিলাম এর চেয়ে সাক্ষ্য আর কি হতে পারে ?

আমি বললাম—পলাশবাবু ; আপনি ভুল করছেন। ঐ সাক্ষ্যের কি দাম আছে পুলিশের সন্দেহের কাছে ? না হয় থাকলামই আমরা ওনার ঘরে। কিন্তু মাঝ রাত্তিরে উনি যে চুপি চুপি উঠে গিয়ে কাজটা সেরে আসেননি তা কে বলতে পারে ? আমরা সারারাত ছিলাম ঠিক কথা কিন্তু জেগে তো ছিলাম না। তাছাড়া ওনার নিযুক্ত কোন লোকের দ্বারাও তো খুনটা হওয়া সম্ভব। এখন চলুন দেখি খুনটা কিভাবে হয়েছে একটু দেখে আসি।

আমরা মৃতদেহের খুব কাছে এগিয়ে গিয়ে বেশ ভালো ভাবে লক্ষ্য করতে লাগলাম। কিন্তু না। কোথাও কোন রক্ত পাতের ব্যাপার নেই। অথচ মানুষটা মৃত।

পালাশবাবু বললেন—ব্যাপারটা বেশ রহস্যময়। তবে এমনও হতে পারে যে আদৌ এটা খুন নয়।

বাসুদেববাবু বললেন—তার মানে, কি বলতে চান আপনি ?

হয়তো ষ্ট্রোক হয়েছে।

আমি বললাম—হতে পারে। তবে আসপাশের পদচিহ্নগুলি দেখে মনে হচ্ছে না কি যে মৃতদেহটিকে বেশ কিছু লোক টেনে হিঁচড়ে নিয়ে এসে এখানে ফেলে দিয়ে গেছে।

সবাই এবার ভালো করে চারিদিক দেখে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম। আসপাশে বেশ কিছু ভারি পায়ের দাগ শিশির ভেজা মাটির ওপর চেপে বসেছে। কিন্তু মৃত্যুটা কিভাবে ঘটল তা ভেবে

পেলাম না। কারণ মুখে কোন বিকৃতি নেই। কোথাও কোন রক্তের ছিটে ফোঁটা নেই। যদিও দেহটাকে নেড়ে চেড়ে সনাক্তকরণ সম্ভব হল না তবুও বুঝলাম অনুমান ঠিক। এটি খুন। ঠিক কোন অ-যন্ত্রণাদায়ক উপায়ে। তবে মৃতদেহের এক পায়ে চটি দেখলাম কিন্তু অপর পা খালি। তার মানে এটিকে টেনে আনার সময় আর এক পাটি চটি খুলে পড়ে গেছে কোথাও।

আমি বললাম—চলুন তো একটু খুঁজে পেতে দেখি। তারপর বাসুদেববাবুকে বললাম—আপনি মশাই থানায় যান। ঘরে গিয়ে পাশাপাশি বাড়ির কোন একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে এখুনি পুলিশ ডেকে আনুন।

বাসুদেববাবু চলে গেলে আমরা অনেক কষ্টে পায়ের ছাপ দেখে এগোতে লাগলাম। এইখানে পায়ের ছাপ স্পষ্ট হলেও অন্য সব জায়গায় অস্পষ্ট। তাছাড়া আকাশ এখনো ভালো করে পরিস্কার হয়নি বলে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখাও সম্ভব হল না।

দু' দশ মিনিটের মধ্যেই অবশ্য আবছা ভাবটা কেটে গিয়ে ভালো করে আলো ফুটে উঠল। আমরা পদচিহ্ন লক্ষ্য করে একটি ভাঙা বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম। বাড়িতে ঢুকে দেখলাম সেখানে কিছু খালি বোতল ইত্যাদি পড়ে আছে। আর এইখানেই পাওয়া গেল আর এক পাটি চটি। কিন্তু এর পর অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কোন পদচিহ্ন দেখতে পেলাম না। রাঙা মাটির মালভূমি অঞ্চল বৃক্ষ লতায় শোভিত হয়ে বহুদূরে মিলিয়ে গেছে।

আমরা যখন কোন রকম সূত্র সন্ধান করতে না পেরে সেই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছি তখন হঠাৎ এক বিশাল শরীর যুবক আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়াল। যুবকটি সন্দেহের চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললো—আপনারা এর ভেতরে কি করছিলেন ?

আমি লোকটির মুখের দিকে একবার তাকিয়ে বললাম—দেখছিলাম এর ভেতরে কিসের আড্ডা বসে।

কিন্তু আপনাদের তো কোনো দিন দেখিনি এখানে ?

আমরা এখানে নতুন এসেছি। বাসুদেব চক্রবর্তীর বাড়ি।

অ। বাসুদেব চক্রবর্তী। যিনি ভাইয়ের সম্পত্তি মেরে নিজে সব কিছু আগলে বসে আছেন।

সে কি!

তবে আর বলছি কি? আপনারা বাইরের লোক। কি আর বলব আপনাদের। বাস্তু ঘুঘু একখানি। সাবেক কালের জমিদার বাড়ি। ওর প্রতিটা থামের ভেতরে সোনা আর টাকার কাঁড়ি লুকনো। ব্যাটা ভাঙছে আর খাচ্ছে। তবে লোক লেগে গেছে পিছনে। দুদিন বাদেই দেবে সাবাড় করে।

আমি বললাম—ওর ভাই এখন কোথায়? সম্পত্তি পাবার জন্য সে কি কোন মামলা করেছে?

তা অবশ্য করেনি। কারণ বেচারি গরীব মানুষ। এক গাদা ছেলে মেয়ে নিয়ে খুব কষ্ট পাচ্ছে।

শুনেছি সে তো একজন নাম করা ক্রিমিন্যাল। ওয়াগন ভাঙা থেকে আরম্ভ করে সব কিছুতেই সিদ্ধ হস্ত।

পেটে ভাত না জুটলে কে সাধু যুধিষ্ঠির হবে মশাই শুনি? যা করে ঠিক করে।

আমি লোকটির আপাদমস্তক একবার ভালো করে দেখে বললাম —আপনি কি এইখানেই থাকেন?

হ্যাঁ! এই নরসিংগড়েই আমার সাত পুরুষের বাস।

কি করেন আপনি? চাকরি না চাষ বাস?

এত কৈফিয়ৎ তো আমি বাইরের লোককে দেবো না মশাই।

না দিলে কিন্তু দিতে বাধ্য করাব।

বলার সঙ্গে সঙ্গেই লোকটি ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। ও যে এইরকম করবে তা জানতাম। তাই চকিতে নিজেকে সরিয়ে নিয়েই ওর চোয়াল লক্ষ্য করে মারলাম এক ঘুসি।

যুবকটি ছিটকে পড়ল একটু দূরে। পরক্ষণেই দ্বিতীয়বার আক্রমণ করবার জন্য রুখে দাঁড়াল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ওর হাতে এসে

ওর চোয়াল লক্ষ্য করে মারলাম এক ঘুসি

গেচে একটি স্প্রিং দেওয়া ছুরি।

আর আমার হাতেও তখন শোভা পাচ্ছে আমার অটোম্যাটিকটা।

লোকটি থতিয়ে গেল আমার ঐ চেহারা দেখে।

বললাম—এক পা এগিয়েছ কি গুলি করব।

আ-আ-আপনি কি পুলিসের লোক ?

পুলিসের লোক কি কিসের লোক একটু পরেই বুঝতে পারবে। আগে বলো এই ঘরে কি হয় ?

এখানে একটু সাট্টা ফাট্টা চলে বাবু। নেশা টেঁশা হয়।

কারা আসে এখানে ?

নাম বললেও কি আপনি চিনবেন ?

তুমি আসো নিশ্চয়ই

হ্যাঁ, তা মাঝে মধ্যে আসি বৈকি।

তুমি যদি এই গ্রামেরই লোক হও আর ঐসব নেশার প্রবৃত্তি যদি তোমার থাকে তাহলে মাঝে মধ্যে নয়, রোজই আসো তুমি।

লোকটি মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল।

কি নাম তোমার ?

আজ্ঞে জয়দেব মণ্ডল।

কাল রাতে তুমি কোথায় ছিলে ?

কাল আমি এখানে ছিলাম না বাবু। কলকাতা গিয়েছিলাম।

কখন গিয়েছিলে ?

আজ্ঞে রাত্রেই গিয়েছিলাম।

রাত্রেই গিয়েছিলে ? আবার ভোরের আগেই ফিরে এলে ? হেলিকপটারে গিয়েছিলে বুঝি ?

না বাবু। ট্রেনেই গেছি। নটার গাড়িতে।

শোনো, মিথ্যে কথা বলে নিজেকে বাঁচাতে যাবার চেষ্টা কোর না। যে কোন গাড়িতেই হোক ধলভূমগড় থেকে হাওড়া যেতে খুব কম করেও চার পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে। তাহলে নটার ট্রেনে চাপলে রাত দুটোয় কলকাতা পৌঁছেছ। এবার কলকাতার কাজ সেরে কটার

গাড়িতে চেপে এত তাড়াতাড়ি এখানে ফিরে এলে বাবা বলতো দেখি।

যুবকটি আর কথা বলতে পারল না। মাথা হেঁট করে বললো—সত্যি বলছি বাবু আমি কাল বাড়িতে ছিলাম না। তবে কলকাতায় যাই নি।

যাক। কোথায় গিয়েছিলে না গিয়েছিলে তা জানবার দরকার নেই আমার। এখন বলতো শশাংকবাবুকে কে খুন করেছে? তুমি না অন্য কেউ?

দেখলাম বিশাল শরীর হলে কি হবে। ভয়ে যুবকের পা দুটি কাঁপছে। বললো—আমি ওসব খুন টুনের মধ্যে নেই স্যার। তাছাড়া আমি জানিই না ও খুন হয়েছে বলে।

ঠিক করে বলো। তুমি ছাড়া দলে আর কে কে ছিল?

যুবকটি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলো—স্যার পালিয়ে আসুন; কেউটে সাপ।

আমি সভয়ে সরে এলাম সেখান থেকে। মুহূর্তের অন্যমনস্কতা। যুবক সজোরে আমার হাতের কব্জিতে একটা ঘুসি মারতেই অটো-ম্যাটিকটা ছিটকে পড়ল কোথায় যেন। আর সেই সুযোগে প্রাণপণে ছুটতে লাগল সে।

পলাশবাবু আর আমি চারিদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে যখন উদ্ধার করলাম সেটাকে যুবক তখন নাগালের বাইরে।

ব্যর্থ হয়ে আমরা ফিরে এলাম। এসে দেখলাম বাসুদেববাবু থানা থেকে দারোগা পুলিশ নিয়ে হাজির।

পুলিশের অসাক্ষাতে লাশ ছোঁবার অধিকার কারো নেই। তাই শশাংকর ডেড বডিতে হস্তক্ষেপ করিনি এতক্ষণ। এবার সবাই মিলে পরীক্ষা করতে লাগলাম সন্ধানী দৃষ্টিতে। না। কোথাও কোন রকম ক্ষত চিহ্ন নেই। অথচ মানুষটা মৃত।

ওখানকার পুলিশের যিনি বড়বাবু তিনি সদাশয় লোক। বললেন—দেখুন আমি যতদিন আছি এই এলাকায় ততদিন কোন রকম খুন খারাপি হতে দেখিনি এখানে। তাছাড়া এখানকার মানুষগুলোও খুব

ভালো। তবে ইদানিং এনাদের দুই ভাইয়ের বিরোধকে কেন্দ্র করে কিছু ব্যাড এলিমেণ্টস্-এর আবির্ভাব ঘটেছে এখানে। কিন্তু সাধারণ লোকের ওপর অত্যাচার বা ঝুট ঝামেলায় এরা থাকে না বলে আমরাও ঘাঁটাইনি ওদের। কিন্তু এখন যখন একটা খুনের ঘটনা ঘটে গেল তখন ভালোভাবেই নজর রাখতে হবে দেখছি এদিকটাতে।

আমি তখন ইতিপূর্বের সেই ভাঙা বাড়ির ঘটনার কথা খুলে বললাম ওদের। তারপর বললাম—জয়দেব মণ্ডল নামের ঐ লোকটাকে সর্বাগ্রে খুঁজে বার করতে হবে। এই নামের কোন লোককে আপনারা চেনেন?

পুলিশ বললো—না।

ইতিমধ্যে আশপাশ থেকে প্রচুর লোক এসে জমা হয়েছে সেখানে। কিন্তু হলে কি হবে এই ঘটনাকে স্থানীয় লোকেরা কেউই খুনের ঘটনা বলে মানতে রাজী নন। তবে পুলিশের কাজ পুলিশ করল। ডেড-বডি পাঠিয়ে দিল ময়না তদন্তের জন্য। এবং সকলের মুখে খোঁজ খবর নিয়ে প্রথমেই গিয়ে হাজির হলাম জয়দেব মণ্ডলের বাড়ি। কিন্তু জয়দেব মণ্ডল নামে যিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন তাঁর সঙ্গে সেই বিশাল শরীর লোকটির তো কোন মিল নেই। অথচ স্থানীয় লোকেরা বললেন, ইনি ছাড়া এই নামের আর কোন লোকই এখানে থাকে না। এমন কি এও বললেন, ঐ ভাঙা মন্দিরে সন্ধ্যের পর কেউই কোন রকম অপকর্ম করতে ঢোকে না। অবশ্য বহিরাগত কুখ্যাত কেউ যদি রাত দুপুরে আস্তানা গাড়ে তাহলে সে কথা আলাদা। কিন্তু গ্রামের কোন যুবক বা কোন দুষ্ট লোক সাপের ভয়ে ভুলেও ঢোকে না ওখানে।

ঘটনাটা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। এক তো মৃতদেহে কোন ক্ষত চিহ্ন নেই। যদি ওটাকে খুন বলে মনে না করি তাহলেও প্রশ্ন জাগে শশাংকবাবুর ঐ দেহটা ওখানে ফেলে গেল কে? অতগুলো পায়ের চিহ্নই বা কাদের? ভাঙা মন্দিরে এক পাটি চটি জুতো পড়ে থাকার কারণই বা কি? এবং জয়দেব মণ্ডল নামের ছদ্মবেশি ঐ যুবকটাই বা কে? যে আমার মতো লোকের চোখে ধুলো দিয়ে

বেমালুম কেটে পড়ল ?

ওর ঘুসির আঘাতে এখনো আমার হাতের কব্জিটা টন টন করছে।

পুলিশকে বিদায় দিয়ে ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আমরা বাসুদেববাবুর বাড়িতে ফিরে এলাম। পলাশবাবুকে পাঠিয়ে দিলাম ঘাটশিলা থেকে আমাদের মালপত্তরগুলো নিয়ে আসতে। আর বাসদেববাবু ? তিনি শুধু একটা কথাই বললেন—এবার আমার পালা।

কারণ ?

আমার ধারণা আমাদের পরিবারের সব কিছু জেনে শশাংকর দলের লোকেরাই ওকে খুন করেছে। ওরা ভেবেছিল খুনের দায়টা আমার ঘাড়েই চাপাবে। তারপর চালাকি করে আমাকে জেলে পাঠিয়ে ওরা এসে তছনছ করবে গোটা বাড়ি। এখন যখন সে চাল ভেস্তে গেল তখন আমাকে সরানো ছাড়া ওদের সামনে আর কোন রাস্তাই খোলা নেই।

আপনাদের বাড়ির এই মোটা মোটা থামের ভেতরে বা অন্য কোন চোরা কুঠুরিতে সত্যিই কি প্রচুর ধন রত্ন লুকনো আছে ?

বাসুদেববাবু বললেন—ছোটবেলায় বাবার মুখে তাই শুনেছিলাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন যদিও কিছু থেকে থাকে তা আমরা কেউই জানতাম না। তাহলে আমার বাবা শেষ বয়সে অমন দারিদ্রতা মাথায় নিয়ে মরতেন না। আমাদের সঞ্চিত ধন সম্পত্তির মধ্যে সোনা দানা যেখানে যা ছিল সব ঐ ভাই নিয়ে পালিয়েছিল। তারপর সেও জাহান্নামে গেল, আমরাও ভিখারি হলাম। আপনি একজন ডিটেকটিভ। পুলিশের সঙ্গে আপনার হৃদ্যতা আছে। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি আপনি পুলিশ এনে গোটা বাড়ি সার্চ করান। দরকার হলে মেসিন বসিয়ে বা কোন যন্ত্রের সাহায্যে যদি কোথাও কিছু থেকে থাকে তাও বার করে নিয়ে যান। ওতে আমার লোভ নেই। এবং সেটা করলে আমিও বিপদমুক্ত হব। সবাই যদি জেনে যায় এই পুরনো অট্টালিকায় মাথা খুঁড়ে মরে গেলেও কিছু মিলবে না তাহলে কিন্তু আমি শান্তিতে থাকব।

বাসুদেববাবুর স্ত্রী এতক্ষণ আড়ালে দাঁড়িয়ে বোধ করি সব কথা শুনছিলেন। এবার কাছে এসে বললেন—আপনাকে আমার একটাই অনুরোধ—।

আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম—কি ?

আমার স্বামীকে একটু বুঝিয়ে বলুন আর এক দণ্ড এখানে না থেকে আমাকে নিয়ে এই বাড়ি ছেড়ে উনি যেন আমার ছেলেদের কাছে চলে যান। পড়ে থাক আমার পৈত্রিক ভিটে। কি হবে বলুন তো এই শত্রুপুরীতে **ধুকুপুকু** প্রাণ নিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থেকে ? এখানে এইভাবে থাকলে একদিন তো আমরা বেঘোরে মরব।

আমি বাসুদেববাবুকে বললাম—কথাটা কিন্তু উনি খুব একটা খারাপ বলেন নি। আমার মনে হয় আপনাদের আর এই বাড়িতে না থাকাটাই উচিত।

বাসুদেববাবু বললেন—এখন আর তা হয় না চ্যাটার্জীবাবু।

কেন হয় না ?

এই বাড়ির জন্যে আমি আমার জীবনের শেষ রক্তবিন্দুও দিতে রাজী আছি। এই বাড়িতে আমি জন্মেছি। এই বাড়িতেই মরব। অতএব মৃত্যু ভয়ে এখান থেকে সরে যেতে আমি রাজী নই।

দেওয়াল ঘড়িতে তখন ঢং ঢং করে নটা বাজল।

আরো কিছুক্ষণ চুপ চাপ বসে থাকার পর হঠাৎ একটা বুদ্ধি মাথায় এলো। আমি রীতিমতো তৈরী হয়ে একাই আবার ঘটনাস্থলে এলাম। দিনের আলোয় চারদিক তখন ঝলমল করছে। ঘটনাস্থলের আশপাশে তখনও কিছু লোকের জটলা ছিল। তাদেরই একজনকে ডেকে বললাম—আচ্ছা এই যে শশাংকবাবু মারা গেলেন। এঁর বউ ছেলে কোথায় থাকে বলতে পারেন ?

লোকটি বললো—শুনেছি গিধনির কাছে কোথায় যেন।

তারা কি খবর পেয়েছে ?

তা কি করে জানব বলুন ? সেখানকার ঠিকানাটা তো আমরা কেউই জানি না।

তাহলে গিধনির কাছে আছে এটা জানলেন কি করে ?

ও নিজেই একবার বলেছিল।

ও তো এখানকারই ছেলে ? তা ওর বন্ধুবান্ধব কেউ নেই এখানে ?

সে রকম কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। কেননা বহুদিন দেশ ছাড়া। হালে এই কয়েক মাস ওকে মাঝে মধ্যে এখানে দেখা যাচ্ছে। তবে পালানদার চায়ের দোকানে ও কিছুক্ষণ আড্ডা দিত। আপনি সেখানে গিয়ে একটু খোঁজ-খবর নিতে পারেন।

আমাকে একটু নিয়ে চলুন তো। কেননা মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক ওর বাড়িতে একটা খবর পৌঁছে দেওয়া খুবই দরকার।

সে খবর তো বাসুবাবুই দিতে পারেন।

উনি তো বলছেন ওর ঠিকানা জানেন না।

লোকটি মুখ ভেংচে বললো— ন্যাকা শিবু। সব জানে। ওর ভাই যেদিন গ্রাম ছেড়ে পালাল সেদিনই যেখানে যা ছিল সব লুকিয়ে রেখে ভাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। এখন ছেলেদের বাইরে পাঠিয়ে নিজেরা কর্তা গিন্নিতে যখের ধন আগলাচ্ছে। জানেনা আবার।

তাই নাকি ?

তাছাড়া কি ? চলুন পালানদার দোকানে যাই। ওর মুখেই সব শুনবেন।

আমি লোকটির সঙ্গে পালানদার দোকানে গেলাম। এ সব ব্যাপারে প্রথমে কেউই মুখ খুলতে চায় না। তাই উনি কিছু বলতে চাইলেন না। অবশেষে চাপে পড়ে বললেন—দেখবেন মশাই, গরীব মানুষ। যেন কোন ঝামেলায় জড়িয়ে দেবেন না। শশাংক যাকে নিয়ে পালিয়েছিল এই গ্রাম থেকে, তার একটি ছেলে ছিল। ছেলেটির নাম লখাই। সে এখন গ্যালুডিতে থাকে। কয়লার ব্যবসা করে। তার ধারণা শশাংক ওর মাকে বিষ খাইয়ে মারে এবং আবার বিয়ে করে ঘর সংসার ফাঁদে। সোনাদানা বা টাকাকড়ি আত্মসাতের ব্যাপারে শশাংকর যে দুর্নাম তা আমরা মানতে রাজী নই। কারণ শশাংক নিজেই তার দুঃখের কথা আমাকে বলেছে। এবং এও বলেছে

কিছু সে নিয়ে পালালেও সব নিয়ে যায় নি। এবং ওর দাদা বাসুদেব বাবু বাবাকে ভুল বুঝিয়ে সমস্ত সম্পত্তি নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছে।

আমি বললাম—দেখুন, এগুলো হচ্ছে আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। বাবা যখন লিখে দিয়েছেন তখন করবার কিছু নেই। আর শশাংক-বাবু যে কাজ করে পালিয়েছেন সেটাও একটা জঘন্যতম নোংরা কাজ। এই কাজ যিনি করতে পারেন তিনি যে সত্যই এদের সর্বস্বান্ত করে যান নি তার কি মানে? যে মানুষ নিজের স্বার্থের জন্যে অন্যের ঘর ভাঙতে পারে সে যে নিজে ঘরেও আগুন দেয় নি এটা কি বিশ্বাসযোগ্য?

পালানদা বললো—হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন বাবু। আসলে শশাংকর কথাই আমি বলছি। কে কি করেছে না করেছে তা তো আমার জানবার কথা নয়। তবে বাবু একটা কথা বলি, শশাংক হচ্ছে বাসুদেববাবুর ছোট ভাই। সে যে ঐ ভাবে মরল তা ওর মনে এতটুকু শোকের ছায়া দেখেছেন?

তা অবশ্য দেখিনি।

একদিন সে যা করেছে তা করেছে। এতদিন বাদে সে যখন ফিরে এলো দাদার কাছে তার কি উচিত ছিল না তাকে ঘরে নেওয়া?

ছিল। কিন্তু সে তো শুনেছি অসৎ সঙ্গে মিশত। চুরি ছিনতাই ডাকাতি করত। এইবার সেই লোককে বাড়িতে ঢোকালে বাড়ির অবস্থাটা কি হোত? সেই লোককে সম্পত্তির ভাগ দিলে সে সম্পত্তি কি সে রাখতে পারত? যে অত টাকা সোনাদানা আত্মসাৎ করেও সব কিছু খুইয়ে বসেছে তার পক্ষে ঐ বাড়ির এক অংশ বিক্রী করে দেওয়া কতক্ষণের ব্যাপার?

পালানদা এবার চুপ করে থেকে বিষয়টা একটু বুঝে দেখবার চেষ্টা করল। তারপর বললো—শশাংকর বউ ছেলে মেয়ে সব গিধনিতে আছে। আর ঐ লখাইও তো এখন কয়লার ব্যবসা করছে আর মস্তানি করছে। ও একটু বেশি রকম বিরক্ত করত শশাংককে। কয়েকবার মার ধোরও করেছে। মাঝে মধ্যে অসম্ভব রকমের টাকা

দাবি করত। আমার যতদূর মনে হয় বাবু এ ঐ লখাইটার কাজ।

আমি বললাম—ঠিক আছে। আর আমার কিছু জানবার নেই। শশাঙ্কবাবুর ছেলে মেয়ে কটি?

দুটি। মেয়েটির বিয়ের বয়স হয়েছে। ছেলেটিও বছর পনেরোর।

আমি সোজা পালানদার দোকান থেকে স্টেশনে চলে এলাম।

স্টেশনের টিকিট কাউন্টারে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম—আজ ভোরে কোন বিশাল শরীর যুবক গ্যালুডি অথবা গিধিনির টিকিট কেটেছে কিনা।

কাউন্টারবাবু হেসে বললেন—খুনের ব্যাপারে পুলিশি তদন্ত বুঝি? তাহলে শুনুন, এই ধরণের লোকেরা টিকিট কেটে ট্রেনে ওঠে না। তবে আপনি যে রকম চেহারার কথা বলছেন ঐরকম চেহারার একজনকে আমরা প্রায়ই এখানে নামা ওঠা করতে দেখি। আজও দেখেছি। ও সকালের প্যাসেঞ্জারে চলে গেছে।

আমি এবার সোজা চলে এলাম বাসুদেববাবুর বাড়ি। ইতিমধ্যে বাসুদেববাবু তাঁর ছেলেমেয়েকে টেলিগ্রাম করে এখানে আসতে লিখেছেন। আমি যেতেই বললেন—পুলিশ রিপোর্ট পেয়ে গেছি।

সেকি! এত তাড়াতাড়ি?

হ্যাঁ। পুলিশ রিপোর্ট বলছে এটি খুনের ঘটনা নয়। ইণ্টারন্যাল হ্যামারেজ।

আমি অবাক হয়ে বাসুদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। খুব ভালোভাবে বোঝবার চেষ্টা করলাম লোকটিকে। মিট মিটে শয়তান নয়তো? টাকার জোরে হয়তো নিজেই ভাইকে মেরে টাকার জোরেই পুলিশও ম্যানেজ করে ফেলেছেন। তবু বললাম—তাহলে বলছেন এটি খুনের ঘটনা নয়?

না। তারপর হঠাৎ একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—দেখুন, যত অপরাধই করুক হাজার হলেও মার পেটের ভাই। যতক্ষণ বেঁচে ছিল ততক্ষণ সে শত্রু ছিল। এখন কিন্তু ও আবার আমার সেই হারানো ভাই। তাই দুজন লোককেও পাঠিয়ে দিয়েছি ওর বউ ছেলে মেয়েকে

নিয়ে আসবার জন্যে, শুধু তাই নয় আমি ঠিক করেছি এখন থেকে ওরা এই বাড়িতেই থাকবে। এত বড় বাড়িতে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। সত্যি বলতে কি হাঁপিয়ে উঠেছি মশাই। তাছাড়া আমার স্ত্রীরও তাই ইচ্ছে। হয়তো এখানে থাকলে ওর ছেলেটা মানুষ হয়ে যাবে। মেয়েটারও বিয়ে থা দেওয়া দরকার। তাছাড়া এই বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে এখানকার অনেক লোকেরই ধারণা আমি নাকি আমার ভাইকে বঞ্চিত করে সব কিছু ভোগ দখল করছি। কিন্তু ওরা তো ভেতরের ব্যাপার জানে না। এখন দেখুক ওরা আমাকে যা ভাবে আমি তা নই।

আপনি তাহলে আপনার ভাইয়ের ব্যাপারে সব কিছুই জানতেন?

সব জানতাম। কোথায় থাকে না থাকে সব। এক এক সময় ভাবতাম, যাই ওর বউ ছেলেমেয়েগুলোর পাশে গিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাঁড়াই। কিন্তু যে মুহূর্তে ওর ঐ চণ্ড মূর্তির কথা মনে পড়ত অমনি ঘৃণায় এবং রাগে সারা শরীর চনমন করে উঠত।

আপনার এই মনোভাবের কথা কিন্তু গোড়ায় আপনি আমাকে বলেন নি। যাই হোক, আপনার অন্তরের যথার্থ পরিচয় পেয়ে খুব খুশি হলাম। এর চেয়ে সুন্দর সলিউশান আর হতে পারে না। এখন তাহলে কি করবেন?

লোকজন সব তৈরী রেখেছি। ওর বউ ছেলেমেয়ে এখানে এসে হাজির হলেই দাহ কার্যটা শেষ করে ফেলব। আমার ছেলে মেয়েদের আসতে অবশ্য দেরি হবে। মেয়ে এলে সন্ধ্যের আগে আসতে পারবে না। ছেলেদের আসতে দু'একদিন দেরি হবে।

সৌদামিনী বললেন—আপনি তাহলে?

আমি বললাম—আপনারা চাইলে আমি আজই চলে যেতে পারি। আমার বন্ধু বিকেল নাগাত এসে পড়বে আশা করি।

বাসুদেববাবু বললেন—না না। একি কথা। আমরা চাইব কেন?

সৌদামিনী বললেন—কিছু মনে করবেন না। মানে আমাদের কোন অসুবিধা নেই। আসলে অশৌচের বাড়ি তো। আপনাদের

আতিথেয়তার অনেক ত্রুটি হয়ে যাবে হয়তো।

আমি বললাম—আমাদের জন্য ভাববেন না। আমরা তো কুটুম নই। যে কাজের জন্য আসা সেই কাজই যখন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো শেষ হয়ে গেল তখন এখানে থেকেই বা কি করব। বন্ধু এসে পড়লে যদি সময় থাকে তাহলে আজই চলে যাবো। নয়তো কাল সকালে আমরা যাচ্ছিই। আমাদের খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করবেন না। বাজারে খেয়ে নিতে পারব।

বাসুদেববাবু বললেন—ও ব্যাপারে আপনাকে একটুও ভাবতে হবে না। সে দায়িত্ব আমার। বরং আপনি থেকে আজকে আমাদের পরিবারের মিলনটা দেখে যান।

আমি সানন্দে এই প্রস্তাব মেনে নিলাম। পাশের বাড়ির একটি মেয়ে এসে আমাকে চা টোস্ট দিয়ে গেল। নিয়মানুযায়ী এ বাড়িতে এখন উনুন জ্বলবে না।

দুই আর দুইয়ে চারের মতোই সব হিসেব ঠিক ঠাক হয়ে গেল। পলাশবাবু সন্ধ্যের পর এলেন। শশাঙ্কবাবুর বউ ছেলে মেয়ে এলো রাত্রি বেলা। ওর ছেলেই মুখাগ্নি করল বাবার। তবে এই বাড়িতে থাকা থাকির প্রস্তাবটা ওর বউ মেনে নিতে পারল না। সে বললো—যার সঙ্গে সম্পর্ক, সেই যখন চলে গেছে তখন এ বাড়িতে আমি কোন অধিকারে থাকব? তবে মেয়েটা আমার কাছে থাকুক। আর ছেলেটাকে আপনারা রাখুন। হাজার হলেও বংশের ছেলে। লেখা-পড়া শিখে যেন মানুষ হয়। বাবার মতো না হয় যেন। আর এই মৃত্যু যে ভাবেই ঘটে থাকুক না কেন, আমার এ ব্যাপারে কোন অভিযোগ নেই। কারণ যে সব লোকেদের সঙ্গে ও মিশত তাতে অপঘাত মৃত্যুই ওর অবধারিত এ আমি জানতাম। আর সেই জন্যেই আমরা মা-মেয়েতে সেলাই বোনার কাজ শিখে সংসারটা চালিয়ে নিচ্ছিলাম।

অভিযোগ যেখানে নেই সেখানে কোন তদন্তও সম্ভব নয়। কিন্তু

তবুও আমর মনে হতে লাগল শশাংকবাবুর ইণ্টারন্যাল হ্যামারেজ কি করে হ'ল ? এক পাটি জুতো ঐ ভাঙা বাড়ির মধ্যেই বা পাওয়া গেল কেন ? এবং সেই বিশাল শরীর যুবক আসলে কে ?

পলাশবাবু সব শুনে বললেন—ছেড়ে দিন তো মশাই। মিটে যখন গেছে তখন অযথা আর কাদা ঘোলা করে লাভ কি ? কাল সকালেই কেটে পড়ি চলুন।

সে তো যাবই। তবে সব কিছুর শেষ না দেখে তো আমি যাই না। তাই ঐ বিশাল শরীর যুবকের মুখোমুখি একবার আমাকে হতেই হবে। কাল ফাস্ট ট্রেনেই চলুন একবার গ্যালুডি যাই। লখাই নামে ছেলেটির একবার খোঁজ করে আসি।

পলাশবাবু বললেন—পাগলের পাল্লায় যখন পড়েছি যেতে তখন হবেই। কথায় আছে না, বাঁমা কেন ঝাড়ে আয় আমার ঘাড়ে।

যাই হোক। সে রাতে ঘুম তো হ'ল না। কোন রকমে ভোরের আলো ফুটে উঠতেই বাসুদেববাবুর শোক সন্তপ্ত পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা স্টেশনের দিকে এগিয়ে চললাম। তারপর টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে সকাল আটটার মধ্যেই গ্যালুডি।

এত সহজে যে রহস্যের আবরণ উন্মোচন হবে তা ভাবিনি। দীর্ঘ দেহ লখাই ওর কয়লার দোকানে একটি লুঙ্গি ও গেঞ্জি পরে নাক ডাকাচ্ছিল। আমরা গিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ওকে তুলতেই ভূত দেখার মতো আঁতকে উঠল সে। এত ভয় পেয়ে গেল যে রীতিমতো কাঁপতে লাগল।

আমি আমার মরণযন্ত্রটা ওর বুকে ঠেকিয়ে বললাম—আমাকে চিনতে পারছ ?

লখাই ভয়ে ভয়ে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

—তোমাকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে।

লখাই কেঁদে আমার পা জড়িয়ে ধরে বললো—দোহাই স্যার। আমার কথাটা আগে শুনুন। আমি ওকে খুন করিনি।

তা না করলেও তুমি একজন গোয়েন্দাকে আঘাত করে মিথ্যে কথা

বলে পালিয়ে এসেছো। তোমার তো বাঁচার কোন রাস্তা আমি দেখতে পাচ্ছি না। পুলিশ এবং ডিটেক্‌টিভের গায়ে হাত দেওয়ার শাস্তি কি তা তুমি জান ?

জানি না। জানতে চাইও না। আমি আপনার পায়ে ধরছি আমাক এবারের মতন ক্ষমা করুন।

ক্ষমার ব্যাপারটা পরে আসছে। এখন যা যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক ঠাক উত্তর দেবে। এবং মিথ্যা কথা বলবার বা পালাবার চেষ্টা করবে না। যদিও পালাতে তুমি পারবে না, কারণ চারিদিকে সাদা পোষাকের পুলিশ তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে আছে। পালাতে গেলেই ধরা পড়বে তুমি। প্রয়োজনে গুলি চলবে।

না। আমি সে চেষ্টা করব না।

ঠিকানা খুঁজে এই জায়গায় যখন এসে পড়েছি তখন বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই পুলিশের খাতায় তোমার নাম কতখানি জায়গা জুড়ে লেখা হয়ে গেছে ?

হ্যাঁ স্যার।

এখন বলতো দেখি সে রাতে ঠিক কি হয়েছিল ? এবং কিভাবে তুমি শশাঙ্কবাবুকে খুন করলে ?

লখাই কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো—আমি ওকে মারিনি হুজুর বিশ্বাস করুন। আমি খুনি নই।

তাহলে ঐদিন ওখানে তুমি কি করছিলে ?

ওকে মারব বলেই গিয়েছিলাম।

কেন ?

কেন ?

আপনি হয়তো জানেন না ঐ লোকটির জন্য আমি সারাজীবন আমার মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি।

আমি সব জানি। তোমার মা নিজে থেকেই তোমাকে তাঁর স্নেহ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন। তার জন্যে ঐ লোকটা দায়ী নয়। কেন তিনি তোমাকে ছেড়ে চলে যান ?

আমার বাবার অত্যাচারের সুযোগ নিয়ে আমার মাকে ও আমার

কাছ থেকে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু পরে আমার মাকে ও বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।

প্রমাণ আছে তোমার কাছে ?

আছে বৈকি। তাই আমিও ওর পিছনে দীর্ঘদিন শনির মতো লেগে থেকে একসময় মেরে ফেলব ঠিক করেছিলাম। বাড়িতে ও খুব কমই আসত। একটা জুয়াচোরের পাণ্ডা ছিল ও। চুরি ছিনতাইও করত। কাল যেখানে ভাঙা মন্দিরের কাছে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয় ঐখানেই মাঝে মধ্যে ওরা ঘাঁটি গাড়ত। এই সব খবর দেবার কিছু লোকও ওখানে আছে আমার। তাই সুযোগ সুবিধা পেলেই ওখানে যেতাম এবং ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করতাম। এমন কি কখনো কেড়েও নিতাম। আসলে আমি চেয়েছিলাম ওকে দুষ্ট গ্রহের মতো ভয় দেখিয়ে তিল তিল করে শেষ করতে। দীর্ঘদিন ধরে ওর লোকেরা চেষ্টা করছিল বাসুদেববাবুকে খুন করে ঐ বাড়ির দখল নেবার। তা সেদিন যখন ওরা পাকাপাকিভাবেই ঐ কাজটা করে ফেলার মতলব নেয় তখন আমিই ওকে খুন করবার জন্য এগিয়ে যাই।

তারপর ?

আমি ওখানে পৌঁছে ওদের গোপন ঘাঁটিতে আড়ি পেতে শুনি ওদের পরিকল্পনটা বানচাল হতে বসেছে। ওরা ঠিক করেছিল ভোরে যখন বাসুদেববাবু প্রাতঃভ্রমণে বেরোবেন খুনটা তখনই করবে কিন্তু হঠাৎ ওরা জেনে ফেলেছে কলকাতা থেকে নাকি দু'জন গোয়েন্দাকে এনে কাজে লাগান হচ্ছে ওদের জব্দ করবার ব্যাপারে। তাই ওদের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেল। ওরা চারজন। আমি একা। মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্র বলতে কিছুই ছিল না ওদের। শুধু একটা লোহার রড ছিল সঙ্গে। যাই হোক ওদের পরিকল্পনা বানচাল হলেও আমার মাথায় খুন ছিল। ভেবেছিলাম আমার এই শাবলের মতো হাত দুটি দিয়ে ওর গলার টুঁটি টিপে মেরে ফেলব ওকে। তা আমাকে দেখা মাত্রই ভয়ে শিউরে উঠল ওরা। একজন রুখে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে এলে

তাকে বেশ করে ঘা কতক দিই। সেই সুযোগে ওরা পালাতে থাকে। তখন আমিও ওদের তাড়া করি। কিছুদূর গিয়েই ধরে ফেলি সব কটাকে। সেখানে আমাদের মধ্যে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। একজনের হাত থেকে লোহার রডটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ফেলে দিই। তারপর একজনের মুখ লক্ষ্য করে ঘুসি মারতে গেলে ঘুসিটা দৈবক্রমে শশাঙ্কবাবুরই ঘাড়ের পিছনে লাগে। আর সেই আঘাতেই ছিটকে পড়ে দু'একবার ছটফট করে স্থির হয়ে যায় ও। ওকে যে ভাবে মারবার ইচ্ছে ছিল আমার সেইভাবে কষ্ট দিয়ে মারতে না পেরে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। অপর লোকটি তখন আমার হাত থেকে রেহাই পেয়ে পালিয়েছে। আমি আর কি করি? ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে এলাম সেখান থেকে। অতরাতে গাড়ি তো নেই। তাই আশপাশেই লুকিয়ে রইলাম। তাছাড়া সত্যিকথা বলতে কি আমার একটা প্রচণ্ড কৌতূহল হ'ল এই ঘটনাটাকে পুলিশ কি ভাবে নেয় তা জানবার। এই সময় আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল। আর সত্যি বলতে কি আপনাকে দেখেই কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলাম আমি। কি যে সব আলফাল বকলাম কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। আপনি আমাকে ছেড়ে দিন স্যার। আমার মৃতা মায়ের দিব্যি আমি আর কখনো কোন খারাপ কাজ করব না।

আমি যন্ত্রটা যথাস্থানে রেখে বললাম—ভয় নেই তোমার। কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না তোমার কথা যদি ঠিক ঠিক হয় তাহলেও শশাঙ্কবাবুর চটি জুতোটা ঐ ভাঙা মন্দিরে গেল কি করে? তোমাকে দেখে ভয়ে পালাবার সময়ে ছেড়ে গেলেও এক পা খালি এবং এক পায়ে চটি পরে নিশ্চয়ই উনি ছুটতেন না। অপর পাটি পথেই পড়ে থাকত।

লখাই বললো—এ ব্যাপারে আমি কিছুই বলতে পারব না স্যার। আসলে তখন মনের অবস্থা এমন ছিল যে কে কি পরেছিল না ছিল তা খেয়ালই করিনি।

আমি বললাম—ঠিক আছে। ধরে নিলাম ঐ চটি জুতোটা ঘটনাস্থলেই পড়েছিল। হয়তো কোন কুকুরে মুখে করে নিয়ে গেছে।

হতে পারে।

কিন্তু শশাংকবাবুর দলের ঐ লোকগুলোর ব্যাপারে তুমি কি কিছু বলতে পারবে ?

স্যার ওদের সবাইকে আমি চিনি। ধরিয়েও দিতে পারি। কিন্তু দল ওদের বিরাট। কান টানতে গেলে যদি মাথা এসে যায় তাহলে কিন্তু আমাকে আপনি ক্ষমা করলেও ওরা বাঁচতে দেবে না। তবে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি বাসুদেববাবুর কোন ক্ষতি আমি হতে দেবো না। যদি এর পরেও কেউ ওনার কোন রকম ক্ষতি করে তখন আমি নিজে গিয়ে পুলিশকে সব কথা খুলে বলবো। আর আমার ঠিকানা তো আপনাদের জানা। আমি তো ওদের মতো উড়ো খৈ নই যে পালিয়ে বেড়াব।

আমি লখাইয়ের পিঠ চাপড়ে বললাম—এই কথাই রইল কিন্তু। কোন ভয় নেই তোমার। আমি তোমাকে মুক্তি দিলাম। আর শোন, অপ্রয়োজনে ঐ অঞ্চলে তোমার আর যাবার প্রয়োজন নেই। তোমার আসল শত্রু তো নিপাতে গেছে !

লখাই আনন্দে আমাদের দুজনের পায়ের ধুলো মাথায় নিল।

আমরা ওর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম। বাইরে কোথাও কোন পুলিশ প্রহরা ছিল না। ওকে ভয় দেখাবার জন্য মিথ্যে কথা বলেছিলাম।

যেতে যেতে পলাশবাবু বললেন—এটা কি রকম গোয়েন্দাগিরি হ'ল ? ও যা বললো ওর কথায় বিশ্বাস করে ওকে ছেড়ে দিলেন ?

আমি হেসে বললাম—মনে হয় মিথ্যে বলে নি। আর বলেই বা ওর লাভ কি। বলার মধ্যে ওর অপরাধের স্পষ্ট স্বীকৃতি তো রয়েইছে। তাছাড়া সব সময় প্রতিশোধ নিয়ে বা লঘুপাপে গুরুদণ্ড দিয়ে সব কিছু সমাধান হয় না। বিশেষ করে শশাঙ্কবাবুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যেখানে ঘটনার জোয়ারে ভাঁটা পড়েছে সেখানে কি লাভ অষথা থিতনো জলকে ঘোলা করে ?

পলাশবাবু বললেন—এখন তাহলে আমরা কোথায় যাচ্ছি ?

আপাততঃ কোথাও একটু জলযোগ সেরে আবার ঘাটশিলায়।

আমরা দুজনে হেঁটে হেঁটে স্টেশনের কাছে এসে একটি চা দোকানে বসে চায়ের অর্ডার দিলাম। পলাশবাবু পাশের একটি দোকান থেকে এক গাদা সিঙড়া কিনে আনলেন।

galporchhabi.blogspot.in

৪

অমন সুন্দর চেহারা সচরাচর চোখে পড়ে না। ঘাড় অব্দি লটকানো চুল। টানা টানা চোখ। আর টকেটকে ফর্সা গায়ের রঙ। ঠিক যেন চাঁপা ফুলের পাপড়ির মতো। বয়সও খুব বেশি নয়। ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। একেবারে গৌরাঙ্গ অবতার যাকে বলে ঠিক তাই। অথচ এই রকম একটি রূপবান ছেলের হাতে হাতকড়া দিয়ে কোমরে দড়ি বেঁধে তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ফৌজদরি কোর্টে। তার অপরাধ? একটি অষ্ট ধাতুর মূর্তি চুরি এবং বাড়ির গৃহিনীকে খুন। ভাবতেও অবাক লাগে এই রকম একটি ফুটফুটে তাজা কিশোর খুন করেছে বলে। যার বাইরের রূপ অমন নির্মল জ্যোছনার মতো তার ভেতরে ঐ রকম পাশব প্রবৃত্তি কি করে জাগে?

ব্যাপারটা আমার মনকে বেশ নাড়া দিল। আমার এক উকিল বন্ধুর কাছে একটি বিশেষ কাজে হাওড়া কোর্টে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখলাম দৃশ্যটা। উকিল বন্ধু বললেন—আমরা ও রকম কত দেখছি ভাই। তুমি দেখো। আসলে লোভ এমনিই জিনিস যে লোভের বশবর্তী হয়ে মানুষ করতে পারে না এ জগতে এমন কিছুই নেই।

উকিল বন্ধুর কথায় কিন্তু আমার মন ভরল না। তাই ওর বিচার দেখতে গেলাম।

আমার মনের মধ্যে যা হচ্ছিল ছেলেটির মুখ দিয়েও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাই ব্যক্ত হল। ছেলেটি আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে বললো—না না না। আমি খুন করিনি। আর ঐ মূর্তি? আমি ওর নিত্য সেবা করি। ও মূর্তি চুরি করে আমার লাভ? তাছাড়া করবই বা কেন?

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন—তুমি যদি সত্যি এ কাজ না করে থাকো তাহলে অনুমান করেতে পারো কে করেছে বা করতে পারে ?

তা কি করে জানব হুজুর। তবে আপনি বিশ্বাস করুন ও কাজ আমি করিনি।

কিন্তু পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট বলছে হেমপ্রভা দেবীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এবং সেই অস্ত্রের হাতলে তোমার হাতের ছাপ। শুধু তাই নয়, বাড়ির মালিক সুধাকান্তবাবুও তোমাকেই সন্দেহ করছেন। এর পরও তুমি বলবে তুমি খুন করনি ?

ছেলেটি এবারও কেঁদে কেঁদেই বলল—হ্যাঁ, এর পরেও আমি বলব আমি খুন করিনি ? আমি চুরি করিনি। কে করেছে তাও জানি না। আমি সন্ধ্যের সময় শীতল আরতি করব বলে ঠাকুর ঘরে গিয়ে দেখি মূর্তি নেই। আর মা ঠাকরুণ ঘরের মেঝেয় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ঘর। মা ঠাকুরুণের বুকের মাঝখানে একটা ছোরা গাঁথা। আমি নিজের হাতে সেটা বুক থেকে তুলে নিই। আর ঠিক সেময়ই বাবু বাইরে থেকে বেরিয়ে এসে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করতে গিয়ে ঐ দৃশ্য দেখেই অজ্ঞান হয়ে যান। তারপর তো থানা পুলিশ অনেক কিছুই হ'ল। পুলিশ আমার কোন কথাই বিশ্বাস করল না। আমাকে ধরে নিয়ে আটকে রাখল।

শুনানি সেদিনের মতো মূলতুবি রেখে জজ সাহেব উঠে চলে গেলেন।

আমি আমার মনোযোগ ছেলেটির প্রতি আরো বেশি করে নিবদ্ধ করলাম। ছেলেটির মুখ দেখে বা তার বক্তব্য শুনে আমার দৃঢ় প্রত্যয় হ'ল যে ছেলেটি নির্দোষ। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম ছেলেটি যদি সত্যিই নির্দোষ হয় তাহলে যে ভাবেই হোক বাঁচাবো তাকে। আর সেই সঙ্গে আমি নিজে পূর্ণ তদন্ত করে আসল ঘুঘুকে খাঁচায় পুরে লটকে দেব ফাঁসির দড়িতে।

সে রাতে অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগলাম ছেলেটির কথা। ওর

সরলাতায় ভরা মুখখানি বার বার ভাসতে লাগল চোখের সামনে।

আইনের চোখে ও হয়তো নাবালক। কিন্তু শিশু ও কিশোরদের মনস্তত্ব নিয়ে বিচার করতে গিয়ে আমি যেটুকু জেনেছি তাতে একেবারে বেওয়ারিশ রাস্তায় ছেলে ছাড়া এই বয়সের কিশোরদের মধ্যে বড় একটা খুন করার প্রবণতা জাগে না। এক্ষেত্রেও ছেলেটি বার বার বলছে সে খুনি নয়। এবং এই অপরাধ সে করেনি। ছেলেটি সত্যিই যদি খুনি না হয় তাহলে তাকে বাঁচানো মানুষ হিসাবে আমার একটা পবিত্র কর্তব্য নয় কি ?

আমি সরকারি গোয়েন্দা নই। প্রাইভেট ডিটেকটিভ। কোথাও কোন রহস্যের গন্ধ পেলে ছুটে যাই। এবং সাধ্যমতো জট ছাড়াবার চেষ্টা করি। ঈশ্বরের কৃপায় এখনো পর্যন্ত ব্যর্থ হইনি আমি। তাই এই ছেলেটির ব্যাপারেও আশা করি সফল হতে পারবো।

আমার উকিল বন্ধু রণেন্দুশেখরকে বলেছি যেভাবই হোক ছেলেটিকে জামিনে ছাড়িয়ে আনতে হবে। পুলিশকেও ফোনে অনুরোধ করেছি এই ব্যাপারে তাঁরাও যেন আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেন।

ছেলেটির সম্পর্কে খোঁজ খবর নিয়ে যা জেনেছি তা হ'ল, ছেলেটি নিরাশ্রয় এবং পিতৃমাতৃহীন। বর্তমানে সুধাকান্ত রায় নামে এক ভদ্র-লোকের বাড়িতে থাকত। তাঁর অন্নে প্রতিপালিত হোত। কোচ-বিহারের মহারজার দেওয়া একটি অষ্টধাতুর মূর্তির সেবা-পূজা করত ছেলেটি। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সে ঐ অষ্টধাতুর মূর্তিটি চুরি করে এবং চুরির জন্যই খুন করে বাড়ির গৃহিনীকে। যদিও মূর্তিটি ছেলেটির কাছ থেকে পাওয়া যায় নি।

রাত এখন দশটা। আজ আর কোন রকম পড়াশুনায় মন বসাতে পারলাম না। ঘরের কোণে কেরোসিন জনতায় ভাত ফুটছে। দুটো ডিম ছিল। একই সঙ্গে সিদ্ধ হতে দিয়েছি। খেয়ে শুয়ে পড়া যাবে।

ছেলেটির পক্ষেও কোন আইনজীবি নেই যে তা নয়। সরকারি উকিল একজন যিনি আছেন ওকে রক্ষা করার ব্যাপারে তাঁরও কোন আগ্রহ নেই। নেহাত দাঁড়াতে হয় তাই দাঁড়িয়েছেন। এখন একমাত্র

আমি যদি এই জটিল রসস্যের জট খুলে নির্দোষ প্রমাণ করতে পারি তো বাঁচে ছেলেটি।

এমন সময়···ক্রিরিরিরিরিং···ক্রি···।

আমি উঠে গিয়ে ফোন ধরলাম। রিসিভার কানে লাগিয়ে বললাম —হ্যাল্লো! অম্বর চ্যাটার্জী স্পিকিং। ।

আমি রণেন্দু বলছি।

হ্যাঁ বলো। কি খবর? জানতে পারলে কিছু?

তার আগে বলো কেসটা কি তুমি সত্যিই নিচ্ছ?

প্লিজ। এর মধ্যে আর কোন কিন্তু রেখো না। ওর ব্যাপারে তদন্তটা আমিই করব। পুলিশকেও আমি সে কথাটা জানিয়ে দিয়েছি। আর উকিল হিসেবে ওর হয়ে তোমাকেই দাঁড়াতে হবে। তুমি 'না' কোরো না।

ব্যাপার কি বলতো? হঠাৎ তুমি ছেলেটির প্রতি এত সদয় হয়ে উঠলে কেন?

তা জানি না ভাই। তবে সত্যিকথা বলতে কি ছেলেটিকে দেখে আমার খুব মায়া হচ্ছে। আর বিশ্বাস করো ওর ঐ অসহায় অবস্থা এবং চোখের জল দেখে আমি থাকতে পারছি না। তাছাড়া কেন জানি না আমার মন বার বার বলছে ছেলেটি খুনি নয়। ও চুরি করেনি।

আমি কালই ওকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু ছেলেটাকে তুমি রাখবে কোথায়?

কেন আমার বাড়িতেই।

তোমার বাড়িতে? তুমি কি জান ছেলেটি যদি সত্যিই খুনি হয় তাহলে ও যখন বুঝবে গোয়েন্দা হয়ে তুমি ওর খুনের তদন্ত করছ তখন হয়তো তোমাকেই খুন করে বসবে। তার চেয়ে আমি বলি কি ও পুলিশের হেফাজতেই থাকুক। তুমি বরং ওর সঙ্গে দেখা করে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে তোমার তদন্ত চালাও। হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় অমন কাঁচা কাজ করতে যেও না। এই বলে রণেন্দু ওর ফোন

নামিয়ে রাখলো।

আমিও ঠিক কি যে করব তা ভেবে পেলাম না। ও একজন বুদ্ধিজীবি মানুষ। কথা যা বললো তা মিথ্যে নয়। কে বলতে পারে যে ছেলেটির ঐ অসামান্য রূপের ভেতরেও একটা কদর্য রূপ নেই? ছেলেটি তো সত্যিই খুন করে থাকতে পারে। বিশেষ করে ওর যখন কেউ কোথাও নেই তখন ওর কাছে আমার এই মোড়িগ্রামের ঘরখানিও যা কয়েদখানাও তাই।

আমি আর দেরি করলাম না। গরম ভাতে ঘি আর ডিম সিদ্ধ দিয়ে খেয়ে নিলাম। তারপর ঠিক কোন কোন পদ্ধতিতে এই কেসটা নিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করব সে বিষয়ে ভাবতে ভাবতে শুয়ে পড়লাম।

পরদিন সকালে যখন আমি পুলিশ হেফাজতে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করব বলে গেলাম তখন ওখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসার রহমন সাহেব আমার সঙ্গে খুবই ভদ্র ব্যবহার করলেন।

রহমন সাহেব এখানে নতুন এসেছেন। কিন্তু মানুষটি খুব ভালো। বললেন—আমারও মশাই মায়া হচ্ছে ছেলেটিকে দেখে। তবে কিনা এই সব ক্রিমিনালদের ধরণ ধারণ যে কত রকমের হয় তা বোঝা মুশকিল। মনে করুন ঘরের ভেতর কেউ নেই। শুধু এই ছেলেটি এবং হেমপ্রভা দেবী ছাড়া। বহুমূল্য একটি অষ্টধাতুর মূর্তি উধাও এবং সেই সঙ্গে গৃহকর্ত্রী খুন। ছোরার হাতলে ছেলেটির হাতের ছাপ। তার ওপর ছেলেটি ওদের অনাত্মীয়। যদিও ভয় দেখিয়ে বা মারধোর করে কোন রকমে ওর মুখ থেকে কোন কথা আমরা বার করতে পারিনি তবুও ছেলেটি নিরপরাধ এমন কোন প্রমাণও আমরা পাইনি। অতএব বাধ্য হয়েই সন্দেহভাজন হিসেবে ওকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। এবং বিচারকের কাছে নিয়ে গেছি। সবচেয়ে আশ্চর্য ঐ বাড়ির যিনি মালিক অর্থাৎ সুধাকান্তবাবু পর্যন্ত ওর ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছু বলছেন না।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। উনি কেবলই বলছেন আপনারা যা ভালো বোঝেন তাই করুন। আমার কি রকম সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

আচ্ছা, এমন কি হতে পারে না, সুধাকান্তবাবু নিজেই খুন করেছেন স্ত্রীকে ?

হতে পারে। তবে বর্তমানে বয়সের ভারে উনি এত বেশি অক্ষম হয়ে পড়েছেন যে এখন আর তাঁকে সন্দেহ করা যায় না।

উনি কি চলা ফেরা করতে পারেন না ?

সব পারেন।, লাঠি ধরে সিঁড়ি দিয়ে নামা ওঠাও করেন। পার্কে গিয়ে বসেন। তবুও বড় দুর্বল।

আমি এ ব্যাপারে ছেলেটির সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

বেশ তো বলুন।

আমি উঠে গিয়ে গরাদের ফাঁক দিয়ে ছেলেটিকে দেখলাম। এক কোণে বসে বসে কাঁদছিল ছেলেটি।

গরাদের তালা খুলে ওকে বার করে আনতেই ছেলেটি আমার পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ল। তারপর কেঁদে বলল—আমাকে বাঁচান। আপনি বিশ্বাস করুন, আমি চুরি করিনি। আমি খুন করিনি। বিনা দোষে আমার জেল হবে, ফাঁসি হবে। আমাকে সবাই বলছে আপনি নাকি আমাকে রক্ষা করবেন বলে এগিয়ে এসেছেন।

সবাই কারা ?

এই তো পুলিশরা। এরা বলছে যে লোক তোর হয়ে দাঁড়িয়েছে তোর আর ভয় নেই। এবার তুই ছাড়া পাবি।

ওরা ঠিকই বলছে। আমি দাঁড়াচ্ছি তোমার জন্যে। কিন্তু বাবা আমি যা জিজ্ঞেস করব তার ঠিক মতো উত্তর যদি দাও তো সহজেই বেরিয়ে আসতে পারবে। নাহলে আমারও কিছু করবার থাকবে না। কেননা পুলিশই বলো আর গোয়েন্দাই বলো আমরা তো আইনের ঊর্ধে নই। আগে বলো তোমার নাম কি ?

আমার নাম রাখহরি চক্রবর্তী।

রাখহরি! এ নাম তো তোমাকে মানায় না। এ তো চাকর বাকরদের নাম। তোমার নাম হওয়া উচিত ছিল রাধামোহন, গৌরাঙ্গসুন্দর এই রকম।

ছেলেটি একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো—কি করব বলুন, মা বাবা আদর করে যে নাম রেখেছেন তাই রয়েছে। শুনেছি আমার দু'তিন দাদা জন্মাবার পরই মারা যান বলে আমার নাম হয়েছে রাখহরি। হরি আমাকে রক্ষা করেছেন।

হরি এবারও তোমাকে রক্ষা করবেন যদি তুমি সত্যি কথা বলো বা নির্দোষ হও।

আমি নির্দোষ।

তোমার মা বাবা বেঁচে আছেন?

না। আমি যখন খুব ছোট তখনই মারা যান তাঁরা। এক বছরের মধ্যে মা বাবা দুজনেই।

তাঁদের কারো কথা মনে পড়ে তোমার?

মায়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে। কী সুন্দর দেখতে ছিল আমার মাকে। দুধে আলতায় গোলা গায়ের রঙ। আমরা খুব গরীব ছিলুম। সেজন্যে পেট ভরে খেতে দিতে পারতেন না বলে আমাকে বুকে নিয়ে কত কাঁদতেন আমার মা।

যাক বাবার কথা তাহলে মনে পড়ে না তোমার?

খুব আবছা। কেননা বাবা তো বর্ধমানে কাজ করতেন। মাঝে মাঝে বাড়ি আসতেন।

দেশ কোথায় তোমার?

আমাদের দেশ জৌগ্রাম। সেখানে অবশ্য কিছুই নেই এখন। কেউ কোথাও নেই।

হুঁ। সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে তোমার পরিচয় কি করে হলো? কি ভাবে তুমি ওনার বাড়িতে এলে?

আমার জেরার উত্তরে ওর মুখ থেকে যা শুনলাম তা হ'ল এই—

রাখহরি যখন সাত বছর বয়স তখন ওর বাবা মারা যান। আট

বছর বয়সে মা। তারপর থেকে এর ওর বাড়িতে মানুষ ও। বাবা মা'র কৃপাতেই গ্রামের পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় যা হবার তা হয়েছিল। তারপর বছর তিনেক কেটে যাবার পর এগারো বছর বয়সে ওর গ্রাম সুবাদে এক কাকা ওকে কলকাতায় নিয়ে আসেন এবং কালীঘাটে পৈতে দিয়ে এক ঠাকুর বাড়িতে রেখে যান। সুধাকান্তবাবু সেখান থেকেই আবিস্কার করেন ওকে। ওর ফুট ফুটে চেহারা এবং ঢল ঢল নিষ্পাপ মুখখানি দেখে অপুত্রক সুধাকান্তবাবু এবং তাঁর স্ত্রী ওকে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে এসে ছেলের মতো আদর যত্নে রেখে দেন। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী তাঁর বহুমূল্য অষ্ট ধাতুর বিগ্রহের সেবা পূজার দায়িত্ব রাখহরিকেই দেন। রাখহরিও নিষ্ঠার সঙ্গে তার কাজ করতে থাকে। সুধাকান্তবাবুরা রাখহরির সৎ-চরিত্রের নিদর্শন পেয়ে এবং তার আনুগত্যে বিগলিত হয়ে ঠিকই করেছিলেন তাকে তাঁরা আইনগতভাবে সন্তান হিসেবে গ্রহণ করবেন এবং তাদের বিষয় সম্পত্তি সব কিছু তাকেই দিয়ে যাবেন। বিনিময়ে রাখহরি ওদের দুজনকে মা বাবা বলে ডাকবে এবং তাঁদের মৃত্যুর পর ছেলের কাজ করবে। অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদিকৃত্য ইত্যাদি। কিন্তু হঠাৎ কিছুদিন আগে সুধাকান্তবাবুর এক ভাগনা পাটনা থেকে এসে সব কিছু গোলমাল করে দিল। সে এসে প্রায় মাসখানেক এই বাড়িতে বসে রইল। এবং রাখহরিকে তাড়িয়ে দিয়ে যাতে তাকে এখানে রেখে দেওয়া হয় এই-রকম আবদারও ধরল। শুধু তাই নয়, এও বলল যে এইসব অজ্ঞাত-কুলশীল ছেলেরা কখনো পোষ মানে না। এবং সুযোগ পেলেই এরা গৃহস্থের বুকে ছুরি মেরে পালায়। যাই হোক, হেমপ্রভা দেবী এবং সুধাকান্তবাবু দুজনেই তাকে সহ্য করতে পারতেন না। কারণ তার চাল চলন কথাবার্তা ছিল লোফারদের মতো। একদিন হেমপ্রভা দেবী খুব যা তা করে অপমান করলেন তাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন। ভাগ্নাবাবুটি বিদায় নিল। তবে যাবার আগে রাখহরিকে শাঁসিয়ে গেল সে যদি এক মাসের মধ্যে সেচ্ছায় এই বাড়ি থেকে চলে না যায় তাহলে তার কপালে নাকি

অনেক দুঃখ আছে।

আমি ধৈর্য ধরে রাখহরির সব কথা শুনছিলাম এতক্ষণ। এইবার তাকে প্রশ্ন করলাম—সুধাকান্তবাবুর সেই ভাগ্নেবাবুর নাম কি ?

ভালো নাম জানি না। তবে ওকে রাজা বলে ডাকা হোত। ওর নাম রাজা রায়।

রাজা রায় এই বাড়ি থেকে বিদায় নেবার কতদিন পরে খুনটা হয়েছে ?

তা ধরুণ চার পাঁচ দিনের মাথায়।

আচ্ছা, এই খুনের ব্যাপারে তুমি কি কাউকে সন্দেহ করো ?

কাকে করব বলুন ? রাজাবাবু থাকলে ওকেই সন্দেহ করতাম। কেননা ওর যা চাল চলন তাতে একাজ করা ওর পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

তা এই খুনের মামলায় সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা অভিযুক্ত করলেন কেন ?

সেটা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না। মা ঠাকরুণ খুব ভোরে উঠে পূজার আয়োজন করতেন। আমিও সাতটা নাগাদ পুজো শেষ করে পড়তে যেতাম। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে চলে যেতাম স্কুলে। ফিরতাম বিকেল বেলা। তারপর একটু ঘুরে বেড়িয়ে এসে সন্ধ্যেবেলা শীতল দিয়ে আবার পড়াশুনা করতে বসতাম। এই ভাবেই দিন চলছিল। এরই মাঝে রাজাবাবু এলেন। তবে রাজা-বাবু চলে যাবার পর বাবু যেন কি রকম হয়ে গেলেন। সেদিন সন্ধ্যে-বেলা আমি যখন ঠাকুর ঘরে শীতল দেবো বলে গেছি তখন দরজা খুলে আলো জ্বেলেই দেখি, সর্বনাশ। চারিদিক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। আর মা ঠাকরুণ মেঝেতে পড়ে আছেন। তাঁর বুকে একটা ধারালো ছোরা গাঁথা আছে। আমি ছুটে গিয়ে সেই ছোরাটা বুক থেকে যখন টেনে তুললাম তখন মা-ঠাকরুণ মরে গেছেন। আর ঠিক সেই সময়ই বাবুও বাইরে থেকে এসে পড়লেন। এসে আমার হাতে ছোরা ও মা ঠাকরুণের ঐ অবস্থা দেখে চিৎকার করে উঠলেন। তারপর জ্ঞান

হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। বাবুর চিৎকারে লোকজন সব হৈ হৈ করে ছুটে এলো। তারপর থানা পুলিশ অনেক কিছুই গড়াল। আমিও অ্যারেস্ট হলাম।

সবই তো বুঝলাম। শুধু বুঝতে পারছি না সুধাকান্তবাবু তোমাকেই বা সন্দেহ করছেন কেন? ঠিক আছে। তুমি নির্ভয়ে থাকো। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করব তোমাকে বাঁচাবার। বলে রাখহরির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নিজের বাসায় চলে এলাম।

হাওড়া শহরের উপকণ্ঠে সুধাকান্তবাবুর বাড়ির সামনে যখন এসে পৌঁছলাম বেলা তখন দশটা। সাবেক কালের বনেদী বাড়ি। কড়ি বরগা দেওয়া ঘর। পাঁচিল ঘেরা বাগান। পুকুর। এক পাশে ঠাকুর ঘর। ঘরের দরজায় শিকল দেওয়া। সুধাকান্তবাবু দোতলায় থাকেন।

আমি যেতেই এক ঘোমটা টানা মহিলা বললেন, কাকে চাই?

সুধাকান্তবাবু আছেন?

হ্যাঁ। ওপরে যান।

আমি ওপরে ওঠার আগে থেমে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কে মা?

আমি এ বাড়ির ঝি।

অ। কতদিন কাজ করছ এখানে?

তা ধরুন না কেন বছর দশেক।

আচ্ছা মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি তোমায়; এখানে রাখহরি নামে যে ছেলেটি থাকত সে ছেলেটি কি রকম? শুনলুম সে নাকি খুনের দায়ে—।

তা কি করে বলব বলুন? এমনি তো খুব ভালো। কিন্তু তার মনে যে এই ছিল তা কি কেউ জানত? ঘরের ছেলের মতোই ছিল। হঠাৎ কি যে মতিচ্ছন্ন হ'ল।

হুঁ। তোমার ঘরে কে কে আছে?

আমার একটি ছেলে ছাড়া কেউ নেই বাবা।

আচ্ছা, রাজাবাবু নামে কাউকে চেনো তুমি ?

কেন চিনবুনি ? বাবুর ভাগ্নে তো। সে কিন্তু ঠিক কথাই বলেছিল। পরের ছেলেকে এইভাবে ঘরে ঢুকিও না। একদিন খুন করে পালাবে। ঠিক তাই হ'ল।

আমি মহিলাকে বেশ ভালো করে এক নজর দেখে নিয়ে বললাম, তুমি কোথায় থাকো ?

ঐ তো। ঐ আমার ঘর। ঐ যে টিনের চালাটা দেখা যাচ্ছে। আপনি কে বাবু ?

আমি তোমাদের বাবুর একজন বন্ধু।

আমি দোতলায় উঠলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বারান্দার গায়ে প্রথম যে ঘরটা সেই ঘরের খাটে একটি পরিস্কার বিছানায় শুয়ে ছিলেন সুধাকান্তবাবু। আর বেশ গাঁট্টা গোট্টা গোছের ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের একটি ছেলে খুব যত্ন করে তাঁর পা টিপে দিচ্ছিল।

আমি যেতেই ছেলেটি বলল, বাবু, কে এসেছেন।

কে ?

আপনি আমাকে চিনবেন না। আমার নাম অম্বর চ্যাটার্জী। আমি একজন প্রাইভেট ডিটেকটিভ।

অ। তাই নাকি ? আসুন আসুন। আসতে আজ্ঞা হোক। ওরে ভোলা ! বাবুকে বসতে জায়গা দে।

ভোলা আমাকে একটা চেয়ার এনে দিল।

আমি চেয়ারে বসে বললাম, তুমি কে ?

আজ্ঞে আমি বাবুকে একটু দেখাশোনা করি। আমার মা এ বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে।

একটু আগে যে মহিলাকে নীচে নেমে যেতে দেখলাম উনিই কি তোমার মা ?

হ্যাঁ।

আমি এবার সুধাকান্তবাবুকে বললাম—আচ্ছা, আপনার বাড়িতে রাখহরি নামে যে ছেলেটিই থাকত আপনার কি ধারণা ঐ ছেলেটিই আপনার স্ত্রীকে খুন করেছে ?

দেখুন, রাখহরি আমাদের ছেলের মতন হয়ে গিয়েছিল। কাজেই কোন কিছুর লোভে ও যে আমার স্ত্রীকে খুন করবে এ হতে পারে না।

অথচ পুলিশকে তো আপনি অন্য কথা বলেছেন ?

মোটেই না। পুলিশকে আমি কোন কথাই বলিনি। সেদিন ঐ দৃশ্য দেখার পর আমি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। তারপর জ্ঞান যখন ফিরল তখন দেখলাম আমার ঘর পুলিশে ভর্তি। আমার তখন উঠে বসারও ক্ষমতা নেই। ওরা আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কি দেখেছি। তা যা দেখেছি তাই বললাম। ওরা তখন একটা কাগজে কি সব লিখে আমাকে সই করতে বলল। আমি করলাম। পরে শুনলাম রাখহরিকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে।

ও। এই ব্যাপার। আচ্ছা এবারে বলুন তো ঐ মূর্তি চুরির ব্যাপারে আপনি কাউকে সন্দেহ করেন কিনা ?

কাকে করব ? তবে রাখহরি নেয় নি। ও নিতে পারে না।

আমি ঠাণ্ডা গলায় বললাম—ছেলেটির ওপর আপনার এত ভাল ধারণা থাকা সত্বেও ওকে যে জেল খাটানোর ব্যবস্থা হচ্ছে সে ব্যাপারে আপনি নীরব কেন ?

কী করতে পারি বলুন ? এখন আমার উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তার ওপর পুলিশ ওকেই সন্দেহ করছে। ছোরার হাতলে ওর হাতের ছাপ আছে। তা পুলিশ যা করার তাই করুক।

সে কি ! ছোরার হাতলে হাতের ছাপ আছে বলেই ছেলেটি অপরাধী হয়ে যাবে ? ও তো আপনার স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে ওটাকে টেনে তুলতেও পারে ? তাছাড়া আপনি তো নিজেই বলছেন এ মূর্তি ও চুরি করতে পারে না। ঘটনায় এও জানা যাচ্ছে খুনের অপরাধে রাখহরিকে যখন ধরা হয়েছিল তখন মূর্তি তার কাছে ছিল না। অর্থাৎ এটা বেশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে চোর মূর্তি চুরি করে পালাতে

যাবার সময় আপনার স্ত্রীর দ্বারা বাধা পায় এবং নিরুপায় হয়েই আপনার স্ত্রীকে খুন করে পালায়।

আপনার অনুমানই ঠিক। আমিও কিন্তু মনে মনে ঐ রকমই চিন্তা করছি।

আমি হেসে বললাম—আপনার ভাগ্নাবাবুর খবর কি ?

সে তো চলে গেছে।

আপনার কি মনে হয় না এই খুনের পিছনে তারও কোন হাত থাকতে পারে ?

সুধাকান্তবাবু বললেন—তার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই তো সে সেই পাটনা থেকে এখানে এসে সামান্য একটু বিষয় সম্পত্তির লোভে আমার স্ত্রীকে খুন করবে—কী যে বলেন মশাই। এ কোন ছিঁচকে চোরের কাজ।

আমি আর এই ব্যাপারে কোন জিজ্ঞাসাবাদ না করে মোটামুটি-ভাবে একটা খসড়া তৈরী করে তাইতে সই করালাম সুধাকান্তবাবুকে। খসড়ার বিষয় বস্তু হ'ল এই যে রাখহরির প্রতি সুধাকান্তবাবুর কোন রকম সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে তিনি যে স্টেটমেণ্টে সই করেছেন তা না জেনে। এই চুরি ও হত্যাকাণ্ড বহিরাগত কারো দ্বারাই সম্ভব।

সুধাকান্তবাবুর কাছ থেকে আমি রাজা রায়ের ঠিকানা নিয়ে সে-দিনের মতো ফিরে এলাম সেখান থেকে।

দিন কয়েকের মধ্যেই রাজা রায়কে অ্যারেস্ট করে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। বেশ সুদর্শন চেহারা। তবে একটু লোফার ও মস্তান প্রকৃতির। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম —আচ্ছা রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু আপনার কে হন ?

মামা।

হুঁ। আপনি কিছুদিন আগে এখানে এসে মামা মামীর সঙ্গে খুব ঝগড়া করে গিয়েছিলেন ?

হ্যাঁ। কারণ আমাকে আমার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা

হচ্ছিল। আমি থাকতে অন্য একটি ছেলেকে এ বাড়িতে রেখে মানুষ করে তার হাতে সর কিছু তুলে দেবার দরকার কি? তাহলে কেন আমি ঝামেলা করব না বলুন? কেন আমি আমার অধিকার ছেড়ে দেবো? আর এ সবই হচ্ছিল আমার মামার যোগসাজসে।

কিন্তু আপনাকে বঞ্চিত করার কারণটা কি?

তা কি করে জানব? তবে মামী আমাকে একদম সহ্য করতে পারতেন না। আসলে ইনি তো মামার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এই বিয়ে নিয়ে আমার মায়ের সঙ্গে মামার প্রচণ্ড ঝগড়া হয়। তারপর থেকে প্রায় বছর দশেক মুখ দেখাদেখি ছিল না। কিন্তু যখন শুনলাম ওরা অন্য একজনকে পোষ্যপুত্র নিয়ে সব কিছু লিখে দেবার মতলব করছে তখন আমি এখানে এসে হুজ্জোতি করি।

এবং পরে এখান থেকে অষ্ট ধাতুর মূর্তিটা হাতিয়ে নিয়ে মামীর বুকে ছুরি মেরে কেটে পড়েন, এই তো? দু'এক দিন আশপাশে গা ঢাকা দিয়ে থেকে কাজটা করেন। যাতে দোষটা পরের ছেলের ঘাড়েই চেপে যায়, কি বলুন?

এসব কি বাজে কথা বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে আপনিই খুন করেছেন। রাখহরির বদলে আপনাকেই ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হবে। আর সেই সঙ্গে সুধাকান্তবাবুকেও বুড়ো বয়সে বেশ কিছুদিন জেলের ঘানি টানাব। সম্পূর্ণ ন্যাকা সেজে একটি নিরীহ ছেলের ক্ষতি হচ্ছে জেনেও বুড়ো ভাম হয়ে বসে থাকার মজা দেখাচ্ছি আমি।

সে যা করবেন করুন। তবে আমার নামে মিথ্যে বদনাম দেবার চেষ্টা করবেন না। আমি খুন করিনি। চুরিও করিনি। ঐ রাখহরি ছেলেটাই আমার ঘাড়ে দোষ চাপাবার জন্য এই সব করেছে।

আমি এখন রাজাবাবুকে না ঘাঁটিয়ে আবার রাখহরির কাছে গেলাম। রাখহরি আমার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে বলল—কী! কিছু হল? আমাকে ছাড়িয়ে আনার কোন ব্যবস্থা করতে পারলেন?

আমি হেসে বললাম—ব্যবস্থা হচ্ছে। তাছাড়া ছাড়া পেয়েই বা

তুমি করবে কি ? যাবে কোথায় ? মা ঠাকরুণ তো নেই। সুধাকান্ত-বাবুও নিশ্চয়ই তোমাকে বাড়িতে ঢোকাবেন না। থাকবে কোথায় ?

ফুটপাথে থাকব। মোট বইব। তবু একটা স্বাধীন জীবন আমার চাই।

আচ্ছা রাখহরি, তোমার মা ঠাকরুণের সঙ্গে বাবুর সম্পর্ক কি রকম ছিল ? মানে, কোন ঝগড়াঝাঁটি হোত কি ?

না। বরং মা ঠাকরুণকে নিয়ে বাবুর খুব চিন্তা ছিল তাঁর অবর্তমানে মা ঠাকরুণের কি হবে ? তিনি কি একা সব কিছু সামলাতে পারবেন ?

আচ্ছা ঐ বাড়িতে যে ভোলার মা কাজ করে সে কি রকম ?

কেন, ভালোই তো। ওর ছেলেটাও ভালো। বড় গরীব ওরা।

আচ্ছা তোমার মা ঠাকরুণকে সুধাকান্তবাবু কোন কারণে খুন করতে পারেন না ?

অসম্ভব। আমি যখন ঘরে ঢুকে মা ঠাকরুণকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর বুক থেকে ছোরা টেনে বার করি, বাবু তখন সবে মাত্র বাইরে থেকে এসেছেন। এই সময় রোজই উনি ঠাকুর প্রণাম করে, ওপরে যান। তা ঐ দৃশ্য দেখেই তিনি যে ভাবে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেলেন তাতে ওনার পক্ষে এ কাজ করা কোন মতেই সম্ভব নয়। বিশেষ করে এই বয়সে উনি কিসের স্বার্থে এ কাজ করতে যাবেন বলুন ?

আচ্ছা এমনও তো হতে পারে রাজাবাবুই এখানে কাছে পিঠে কোথাও দু' একদিন লুকিয়ে থেকে ঐ কাজ করে তারপর পাটনায় চলে যায় ?

হতে পারে। তবে এ ব্যাপারে হ্যাঁ না কিছুই আমি বলতে পারব না আপনাকে।

জিজ্ঞাসাবাদ যতই চলছে অবস্থা ততই ঘোরালো হয়ে উঠছে। রাজাবাবু, সুধাকান্তবাবু এবং রাখহরির মধ্যে কে যে আসল অপরাধী তা কে জানে ? তবে সুধাকান্তবাবু মানুষটি বড়ই রহস্যময়।

সে রাত্রিটা এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনার মধ্যে কাটল আমার। মনে মনে যত রকম ছক তৈরী করি সবই কি রকম এলোমেলো আর অসার বলে মনে হয়। রাজা রায় যে যুক্তি দেখিয়েছে তা নেহাৎ ফেলে দেবার মতো নয়। আপাতঃ দৃষ্টিতে রাখহরিকে নির্দোষ বলেই মনে হয়। আর সুধাকান্তবাবু কি ওই বয়সে নিজের স্ত্রীকে এইভাবে হত্যা করবেন! এ হতে পারে না। বিশেষ করে ঐ দৃশ্য দেখার পর যে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায় তাঁকে সন্দেহ করারও কোন অবকাশ নেই।

সবচেয়ে রহস্যময় ব্যাপার হ'ল মূর্তিটা গেল কোথায়? এই অঞ্চলে বহু অনুসন্ধান করেও ঐ অষ্টধাতু মূর্তির কোন হদিশ পাওয়া যায় নি। মূর্তিটা হয় এখানেই লুকোন আছে কোথাও নয় তো স্থানান্তরে বহুদূরে চলে গেছে।

পরদিন সকালে রহমন সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে এবং কিছু পুলিশ সহ সুধাকান্তবাবুর বাড়ি, বাগান, পুকুর তল্লাসী করতে চললাম। মেন গেট বন্ধ ছিল। অনেক ডেকেও সাড়া না পেয়ে পিছন দিকে গিয়ে বাগানের পাঁচিলের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কিন্তু ভেতরে ঢুকে যা দেখলাম তাতে শিউরে উঠলাম। বারান্দার নীচে মাটিতে ঘাসের ওপর সুধাকান্তবাবু উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। মুখের কাছে নাকের কাছে চাপ চাপ রক্ত। না খুন নয়। খুব সম্ভবতঃ বারান্দার রেলিংএ কোন কারণে ভর দিয়ে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেছেন। সুধাকান্তবাবুর এই মর্মান্তিক পরিণতি সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক।

যাক। পুলিশ গোটা ঘর তল্লাসী করেও কিছুই পেল না।

ভোলা বা ভোলার মা কারো পাত্তা নেই।

রহমন সাহেবের চার্জে সব কিছু রেখে একজন কনস্টেবলকে নিয়ে ভোলাদের বাড়ি গেলাম।

আমাকে দেখেই এবং সঙ্গে পুলিশ দেখে আঁতকে উঠল ওরা।

আমি ভোলার মাকে বললাম—কী ব্যাপার! এখনো কাজে যাওনি যে?

ভোলার মা ফ্যাকাশে মুখে ম্লান হেসে বলল, আমি একটু দেরি করেই ও বাড়িতে যাই। কিন্তু আপনারা কোন দিক দিয়ে এখানে এলেন বাবু?

মেন গেট বন্ধ। তাই পিছন দিক দিয়ে এলাম। কিন্তু সুধাকান্ত-বাবুকে ঘরে দেখতে না পেয়ে এখানে এলাম আমরা। কোথায় উনি?

ভোলার মা চমকে উঠল—সেকি! উনি ঘরে নেই?

না। তুমি ওবাড়িতে কাজ করো। তোমার ছেলেও ওনার দেখা শোনা করে অথচ মানুষটা যে বাড়িতে নেই একথা তোমরা জান না? তাছাড়া সেদিন যখন বেলা দশটা নাগাদ আমি এখানে এসে-ছিলাম তুমি তখন কাজ করে ফিরে আসছিলে। আর আজ বেলা দশটা বেজে গেল এখন তুমি কাজে গেলে না কেন? তারপর ভোলাকে বললাম—তা বাবা ভোলানাথ, সেদিন সকালে গিয়ে তো দেখলাম দিব্যি বসে বসে বাবুর পদ সেবা করছিলে। আজ এখনো এখানে যে? ব্যাপারটা কি?

ভোলা কাঁপা কাঁপা গলায় বলল—বিশ্বাস করুন বাবু, কাল সারা রাত খুব পেটের যন্ত্রণা হয়েছে। বিছানা থেকে একদম উঠতে পারিনি। এই এখনই যাব ভাবছিলাম।

তা এত বেলা হল, তুমি যে সকাল থেকে যেতে পার না সে কথা তোমার মাও একবার গিয়ে বাবুকে বলে আসার দরকার মনে করল না? তাহলেই তো টের পেতে মানুষটা আছেন কি নেই।

ভোলার মা বলল—বাবু, সত্যিকথা বলতে কি আমরা গরীব লোক। কাল ছেলেটার খুব শরীর খারাপ ছিল। তাই ও রাত্রেও শুতে যেতে পারেনি। আমি বাবুকে রাত্রিবেলা খাইয়ে দাইয়ে সেকথা বলে এসেছিলাম। কিন্তু আজ সকালে বাবুকে দেখতে গিয়ে দেখি—

বাবু বারান্দার রেলিং ভেঙে নীচে পড়ে গিয়ে মারা গেছেন, এই তো?

হ্যাঁ।

আর সেই ভয়ে পাছে বাইরের লোক কেউ এসে দেখে ফেলে তাই মেন গেট বন্ধ করে মা ব্যাটায় ঘরে ঢুকে বসে আছ। কেউ যেন টের

না পায়। বলিহারী বুদ্ধি।

হ্যাঁ বাবু।

তা বাবা ভোলানাথ, তোমাকে যে এবার থানায় যেতে হবে আমাদের সঙ্গে। ওঠো।

ভোলা হাউ মাউ করে কেঁদে উঠে দাঁড়াতেই বললাম—একি! তোমার পায়ে এত পানা লেগে কেন?

ও কিছু নয় বাবু। কাল সন্ধেবেলা পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলাম।

আমার মনের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকের মতো এক ঝলক সন্দেহ উঁকি দিল। বললাম—এই, কোথায়? কোন পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলে? আমায় একটু দেখাবে চল তো।

ভোলা বলল—চলুন।

আমি ভোলাকে সঙ্গে নিয়ে পুকুর পাড়ে এলাম।

এবার বলো কোনদিকে তুমি মাছ ধরেছিলে?

ভোলা তখন একটা জায়গা দেখিয়ে দিল।

আমি ভালো করে জায়গাটা লক্ষ্য করে বললাম—না। তুমি ঠিক বলছ না। এখানে তুমি আসনি। এখানকার ভিজে মাটিতে কাদায় তোমার পায়ের কোন ছাপ দেখছি না।

ভোলা তখন ন্যাকা সাজার ভান করে বলল, তাহলে কোন দিক দিয়ে এসেছিলাম কে জানে।

তোমাকে আর জানতে হবে না। আমিই জেনে নিচ্ছি। বলে আমার সঙ্গের কনস্টেবলকে বললাম—লোকটাকে একটু নজরে রাখো তো। মনে হচ্ছে বেশ রীতিমতো গোলমাল আছে। লক আপে পুরে রহমন সাহেবকে দিয়ে বেশটি করে ঘা কতক দেওয়ালেই সব কথা বেরিয়ে যাবে ওর মুখ থেকে।

ভোলার মুখে আর কথাটি নেই।

মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ওব মুখ।

আমি তখন তন্ন তন্ন করে চারিদিক খুঁজতে লাগলাম। খুঁজতে খুঁজতে একদিকে আবিস্কার করলাম পুকুরে নামার অনুপযুক্ত এই

জায়গাটা দিয়ে কেউ নেমেছে উঠেছে। সেই পথ ধরে আমিও নিচে নেমে গেলাম। দেখলাম এক জায়গায় পুকুরের নরম মাটি কাদায় পায়ের গভীর ছাপ। আর পুকুরের এক কোণে লম্বালম্বিভাবে একটি কঞ্চি পোঁতা আছে। জলের মতই পরিষ্কার। কোন কিছু লুকনো আছে ওখানে।

আমি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এসে ভোলার বুকে পিস্তল তাগ করে বললাম—ওখানে কি লুকিয়ে রেখেছিস বল ?

কি-কি-কিছুই রাখিনি বাবু।

ঠিক করে বল। নাহলে তোর বাঁচার কোন রাস্তা নেই।

ভোলা মাথা হেঁট করে বলল—ওখানে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো একটা বাক্সয় করে রাখা আছে।

হু, গয়না তুই পেলি কোথায় ?

কাল রাতে বাবু ঘুমিয়ে পড়লে আমি বালিশের তলা থেকে চাবি বার করে সিন্দুক খুলে মা ঠাকরুণের সমস্ত গয়না চুরি করে নিই। তারপর সব নিয়ে যখন পালাতে যাই বাবু তখন জেগে ওঠেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো নিভিয়ে দিই। উনি তখন চোর চোর বলে চেঁচিয়ে যেই না ঘর থেকে বেরতে যাবেন আমি অমনি বাবুকে ধাক্কা দিয়ে পালাতে যাই। আর সেই ধাক্কায় বাবু টাল সামলাতে না পেরে বারান্দার রেলিং টপকে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। অমনি হয়ে যায় ঐ বিপজ্জনক কাণ্ড। নাহলে সত্যি বলছি বাবু বিশ্বাস করুন খুন করবার মতলব নিয়ে কিছু আমি করিনি।

তা না হয় হ'ল। এইবার বল তো বাবা অষ্টধাতুর মূর্তিটাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস ?

ওটার ব্যাপারে আমি কিছু জানি না, বিশ্বাস করুন।

রহমন সাহেব যে কখন কথার ফাঁকে আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তা লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ রাগের মাথায় ভোলার তলপেটে একটা লাথি কষিয়ে বললেন—বল শিগগির।

লাথি খেয়ে ককিয়ে উঠল ভোলা। দু'হাতে পেট ধরে কাঁদতে

বেশ করে ঘা কতক দিই···

কাঁদতে বলল—আমি জানি না বাবু, বিশ্বাস করুন। সত্যি বলছি, আমি জানি না।

বিশ্বাস করছি, দাঁড়া। বলেই রহমন সাহেব বললেন—এই, আমার রুলটা নিয়ে আয় তো গাড়ি থেকে। বেশ করে ঘা কতক দিই। না দিলে মুখ খুলবে না।

ভোলার মা কাছে পিঠেই কোথাও ছিল বোধ হয়। ছুটে এসে রহমন সাহেবের পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। বলল—ও না বলুক। আমি বলছি বাবা। দয়া করে ওকে মেরো না। মূর্তিটা আসলে রাজাবাবুর কাছে আছে।

রাজাবাবুর কাছে? সেকি!

হ্যাঁ বাবু, রাজাবাবু যেদিন পাটনা চলে গেলেন তার পরদিনই আমাদের এখানে এসে হাজির।

তারপর?

আমি অবাক হয়ে বললাম—একি রাজাবাবু! আপনি বাড়ি যান নি?

রাজাবাবু বললেন—না। তবে আমি যে এখানে এসেছি তা যেন কেউ জানতে না পারে। বলেই আমার হাতে একশোটা টাকা দিয়ে বললেন, যে ভাবেই হোক ঠাকুর ঘর থেকে অষ্টধাতুর মূর্তিটা এনে দিতে। কেননা রাখহরিকে মিথ্যে মামলায় না জড়ালে বা ওর প্রতি মামা মামীর মন বিরূপ করতে না পারলে এই সম্পত্তি তাঁর হবে না রাজাবাবুর মতলব ছিল মূর্তি চুরির পর এটা নিয়ে যখন খুব হৈ চৈ হবে সেই সময় মূর্তিটা লুকিয়ে রাখহরির ঘরে কোথাও লুকিয়ে রেখে পুলিশকে খবর দেওয়া। আমি প্রথমে রাজি হইনি বাবু। রাজাবাবু তখন আমাকে অনেক লোভ দেখালেন। বললেন, রাজাবাবু যদি এই সম্পত্তির মালিক হন তাহলে আমাদের আর কোন অভাব রাখবেন না। আমার ভোলাকে সব সময় তাঁর কাছে কাছে রাখবেন। এবং মাস গেলে মোটা টাকা মাইনে দেবেন।

সেই লোভে সুধাকান্তবাবুর স্ত্রীকে খুন করে ঐ মূর্তি তুমি রাজা-

বাবুর হাতে তুলে দিয়েছিলে তাই না ?

না। আমি খুন করিনি বাবু। সেদিন সন্ধ্যেবেলা ঠাকুর ঘর মোছবার অছিলায় চাবি খুলে ঘরে ঢুকে যেই না মূর্তির গায়ে হাত দিয়েছি অমনি দেখি মা-ঠাকরুণ দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

আচ্ছা, সন্ধ্যেবেলা কেন ? তুমি তো মূর্তি চুরি করতে রাত্রিবেলাও আসতে পারতে।

রাত্রিবেলা কি করে আসব বাবু। চাবি যে ঠাকরুণের কাছে থাকত। আমি সন্ধ্যেবেলা চাবি খুলে ঘর মুছতাম। আর মা ঠাকরুণ আরতির ব্যবস্থা করে দিতেন। তারপর রাখহরি ঠাকুরের শীতল দিয়ে চলে গেলে মা নিজে হাতে ঘরে তালা দিয়ে চলে যেতেন। কাজেই ঐ সময়টাই ছিল মূর্তি চুরির আসল সময়।

তারপরে কি হল বল।

হ্যাঁ, মা ঠাকরুণ তো আমাকে দেখেই অবাক হয়ে বললেন, একি সরলা তুই! একি করছিস ? ঠাকুর তুলেছিস কেন ? ভয়ে আমার হাত থেকে তখন মূর্তিটা পড়ে যায় আর কি ? আর ঠিক সেই সময়ই কে যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার হাত থেকে মূর্তিটা ছিনিয়ে নিল। আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখি মা-ঠাকরুণ মেঝেয় পড়ে কাতরাচ্ছেন। তাঁর বুকে ছুরি গাঁথা। চেয়ে দেখি দরজার পাশে রাজাবাবু। আমাকে বললেন, হাঁ করে দেখছিস কি ? শিগগির পালা। একথা কাউকে বলবি না। তাহলে তোদের মা ব্যাটা দুজনকেই পুঁতে ফেলব।

আমরা অবাক বিস্ময়ে সব কিছু শুললাম।

ভোলার মা এবার গড় গড় করে বলে চলল—রাজাবাবু বড় সাংঘাতিক লোক বাবু। তাই ভয়ে আমরা মুখ খুলিনি। বিনা দোষে রাখহরিকে পুলিশ এসে ধরে নিয়ে গেল, তাও চোখ চেয়ে দেখলাম। বাবুও দু' তিন দিন অজ্ঞান অচৈতন্যর মতো পড়েছিলেন। তারপর জ্ঞান হলে একদিন বললেন, দেখ ভোলার মা! আমার কি মনে হয় জানিস ? রাখহরি তোর মা-ঠাকরুণকে খুন করেনি। এ ঠিক ঐ শয়তানটার কাজ। রাজাই ওকে খুন করেছে। অথচ আমার

দিদির ঐ একটিই মাত্র ছেলে। যদি ধরিয়ে দিই তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। দিদি আমার বাঁচবে না। বুড়ো বয়সে হার্টফেল করবে। জামাইবাবু বেঁচে নেই। ঐ ছেলেটিই দিদির সব। তবে যাক। আমার সম্পত্তির ভাগ ওকে আমি দিচ্ছি না। যে কটা দিন বেঁচে আছি তোরা যদি আমার দেখা শোনা করিস তো তোদের নামেই লিখে দিয়ে যাব। তবে মুখে সে কথা বললেও কাগজে কলমে বাবু কিছু করে যাননি। অবশ্য করে গেলেও ঐ সম্পত্তির ওপর আমাদের খুব একটা লোভ ছিল না। কারণ ঐ সম্পত্তি ভোগ করলে রাজাবাবু আমাদের ছাড়ত না। তাই আমরা মা ব্যাটাতে যুক্তি করে মা ঠাকরুণের গয়নাগুলো চুরি করেছিলাম! ভেবেছিলাম! একদিন চুপি চুপি এখান থেকে পালিয়ে যাব।

galpobhabi.blogspot.in

আমি বললাম—থাক। এবারে যা কিছু বলবার থানায় গিয়ে বলবে। তোমাদের কথা গুলো ওখানে টেপ করা দরকার। চলো সব।

একজন কনস্টেবল পুকুর থেকে মা-ঠাকরুণের গয়নাগুলো উদ্ধার করে আনলে পুলিশ ভোলা ও ভোলার মাকে থানায় নিয়ে গেল।

মর্গ থেকে লোক এলো সুধাকান্তবাবুর মৃতদেহ ময়না তদন্তে নিয়ে যাবার জন্য। আমিও আর দেরি না করে সোজা আমার উকিল বন্ধু রণেন্দু শেখরের বাড়িতে চলে এলাম।

আমি সেইদিনই রাখহরিকে জামিনে খালাস করলাম। তারপর পরম আদরে তাকে নিয়ে এলাম আমার মৌড়ি গ্রামের বাড়িতে অনেক দিন ধরে মনে মনে এই রকম একটি ছেলেকেই খুঁজছিলাম আমি। এতদিনে পেলাম, রাখহরিও আমার বাড়িতে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে দারুণ খুশি হল। আদালতের বিচারে রাখহরি বেকসুর খালাস পেলেও বিচারক ভোলা ও ভোলার মায়ের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং রাজা রায়ের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিলেন।

———